POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَا تَنۡقِمُ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنۡ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ
رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتۡنَا ؕ رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ
عَلَيۡنَا صَبۡرًا وَّتَوَفَّنَا مُسۡلِمِيۡنَ ۝

এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ লইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসিল। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে আত্ম-সমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।'

(আল আরাফ: ১২৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 35

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 1 সেপ্টেম্বর, 2022 4 সফর1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সুদ খাওয়ার নিন্দা এবং এর শাস্তি

২০৮৫) হযরত সামরা বিন জানদাব (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) বলেছেন- আজ রাত্রিতে স্বপ্নে দুই ব্যক্তিকে দেখেছি যারা আমার কাছে এসে আমাকে এক পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে যায়। আমি পথ চলতে চলতে একটি রক্তের নদীর কাছে এসে পৌঁছই যার তীরে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিল আর তার সামনে পাথর খণ্ড রাখা ছিল আর নদীর ঠিক মাঝখানে অপর এক অবস্থান করছিল। তখন নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি যখন এগিয়ে আসতে চাইল, তখন সেই তীরে দাঁড়িয়ে থাকা দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তার মুখে পাথর ছুড়ে মেরে তাকে পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে দেয়। এইভাবেই যখনই সে বের হওয়ার জন্য অগ্রসর হত, তখন তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করা হত যার ফলে পূর্ববত স্বস্থানে ফিরে যেত। আমি বললাম, ব্যাপারটা কি? সে বলল: যে ব্যক্তিকে আপনি নদীর মাঝে দেখলেন সে সুদখোর।

লাউ আঁ হযরত (সা.)-এর প্রিয় তরকারি ছিল

২০৯২) হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,'এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ (সা.) ভোজনের জন্য আমন্ত্রিত করে যা সে প্রস্তুত করেছিল। হযরত আনাস বিন মালিক বলেন, 'সেই নেমন্তন্নে রসুলুল্লাহ্ (সা.) -এর সঙ্গে আমিও যাই। সে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে রুটি ও ঝোল পরিবেশন করে যার মধ্যে লাউ ও মাংস ছিল। আমি নবী (সা.) কে দেখেছি তিনি বাটি থেকে লাউ বেছে খাচ্ছেন। হযরত আনাস বলেন, আমি সেই দিন থেকে লাউ পছন্দ করি। (সহী বুখারী, ৪র্থ খণ্ড)

জুমআর খুতবা, ২২ জুলাই ২০২২
ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।
প্রশ্নোত্তর পর্ব

সাধক সেই সব লোকেরা যারা নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করে আর এই পরিবর্তনের কারণে তাদের হৃদয়ের মধ্যেকার পাপের অন্ধকার এবং মলিনতা দূরীভূত হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

দেখ! মানুষ যত নিজের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে, ততই সে সাধক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। কুরআনের জ্ঞান ও তত্ত্বদর্শিতা মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত লাভ করতে পারে না যতক্ষণ সে সাধকদের অন্তর্ভুক্ত হয়। লোকেরা সাধক-এর অর্থ করতে বুঝতে ভুল করেছে, তারা নিজে থেকেই সম্পূর্ণ এক ভিন্ন অর্থ মনে করে বসেছে।বস্তুত, সাধক সেই সব লোকেরা যারা নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করে আর এই পরিবর্তনের কারণে তাদের হৃদয়ের মধ্যেকার পাপের অন্ধকার এবং মলিনতা দূরীভূত হয়। শয়তানের রাজত্ব উৎপাটিত হয়ে তাদের হৃদয়ে খোদা তা'লার আরশ বিরাজ করে। অতঃপর তারা রুহুলকুদুস থেকে শক্তিলাভ করে এবং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আশিসমণ্ডিত হয়। আমি তোমাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি, তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করবে সে সাধক। মানুষ যদি খোদার দিকে এক পা এগিয়ে আসে তবে আল্লাহর কৃপা তার দিকে ছুটে আসে এবং তার সহায় হয়। এটা সত্য কথা আর আমি তোমাদেরকে বলছি, ধূর্ততা দ্বারা কুরআনের জ্ঞান অর্জিত হয়। কেবল মানসিক শক্তি এবং বৌদ্ধিক উন্নতি কুরআনের জ্ঞানের প্রতি নিবিষ্টতা তৈরীর একমাত্র কারণ হতে পারে না। এর জন্য তাকওয়াই প্রকৃত মাধ্যম খোদা হলেন মুত্তাকিদের শিক্ষক। এই কারণেই নবীরা জাগতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিরক্ষর হয়ে থাকেন। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লা এই কারণেই নিরক্ষর করে পাঠিয়েছেন। তিনি (সা.) কোন পাঠশালায় শিক্ষা পান নি আর কাউকে শিক্ষক হিসেবেও গ্রহণ করেন নি। তা সত্ত্বেও তিনি সেই সত্য ও তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনা করেছেন যা জাগতিক জ্ঞানের বিদ্বানদের অভিভূত করেছে। কুরআন শরীফের ন্যায় পবিত্র ও পূর্ণাঙ্গ ধর্মগ্রন্থ তাঁর মুখ দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, যার বাগ্মিতা ও সাহিত্যিক ঔৎকর্ষ সমগ্র আরবকে নীরব করে রেখেছে। কি সেই বিষয় ছিল যার কারণে আঁ হযরত (সা.) জ্ঞানের ক্ষেত্রে সকলকে ছাপিয়ে গেলেন? সেটা তাকওয়াই তো ছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা.) -এর পবিত্র জীবনের বিষয়ে এর থেকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হতে পারে যে তিনি কুরআন শরীফের ন্যায় কিতাব এনেছেন যার তত্ত্বজ্ঞান জগতকে বিস্ময়াভিভূত করেছে।

তাঁর যে অক্ষর পরিচয় ছিল না তা একথার প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত যে কুরআনের জ্ঞান বা ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের জন্য তাকওয়ার প্রয়োজন, জাগতিক ধূর্ততা নয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৬)

চুক্তি মান্য করা জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য ভীষণ জরুরী। অতএব মানুষের উচিত যেভাবেই হোক নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যাতে বিশ্বাস বজায় থাকে আর মানুষ স্বেচ্ছায় ভালবেসে অপরের সাহায্য করতে প্রস্তুত হয় আর এইরূপে জাতির অগ্রগতি হয়।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহল এর ৯৩ নং আয়াত

وَلَا تَكُوۡنُوۡا كَالَّتِىۡ نَقَضَتۡ غَزۡلَهَا مِنۡۢ
بَعۡدِ قُوَّةٍ اَنۡكَاثًا ؕ تَتَّخِذُوۡنَ اَيۡمَانَكُمۡ دَخَلًا ۢ بَيۡنَكُمۡ
اَنۡ تَكُوۡنَ اُمَّةٌ هِىَ اَرۡبٰى مِنۡ اُمَّةٍ ؕ اِنَّمَا يَبۡلُوۡكُمُ اللّٰهُ
بِهٖ ؕ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَـكُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ مَا كُنۡتُمۡ فِيۡهِ
تَخۡتَلِفُوۡنَ

এর ব্যাখ্যায় বলেন: এই আয়াতের শব্দাবলী থেকে এটাও জানা যায় যে, এতে ভিন জাতির সঙ্গে চুক্তিরও উল্লেখ রয়েছে। এই আয়াত থেকে নতুন একটি বিষয় শুরু হচ্ছে বলে ধরতে হবে। আর এর অর্থ হবে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার অঙ্গীকার এবং নিজেদের মধ্যেকার অঙ্গীকার রক্ষা করা করা আবশ্যক, অনুরূপভাবে ভিন জাতির সঙ্গে যে সব অঙ্গীকার করা হয়েছে সেগুলি রক্ষা করাও জরুরী। এই সব অঙ্গীকার বা চুক্তি মান্য করে চল, অন্যথায় পৃথিবীর শান্তি নষ্ট হবে। 'দাখালান' শব্দ থেকেও প্রতীয়মান হয় যে كَالَّتِىۡ نَقَضَتۡ غَزۡلَهَا مِنۡۢ بَعۡدِ قُوَّةٍ এর অর্থ হল শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিশৃঙ্খলা তৈরী না করা।

এক্ষেত্রে আয়াতের তিনটি অর্থ হতে পারে।

১) কোনও একটি জাতি বর্তমানে শক্তিশালী, তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করার শক্তি রাখ না, তাই তার সঙ্গে চুক্তি করলে। আর চুক্তি করার পর যখন তারা তোমাদের বিষয়ে উদাসীন হয়ে পড়ে, তখন গোপনে প্রস্তুতি নিয়ে একদিন অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের ধ্বংস করে ফেলবে- এমনটা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। রাজনৈতিক জগত এই ধরণের আচরণ হামেশাই করে থাকে।যেহেতু ইসলামের ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে ন্যায়, পরোপকার এবং আত্মীয়দের দানের উপর, তাই শত্রুদের প্রতিও এমন আচরণ করাকে ইসলাম অপছন্দ করেছে এবং তা করতে নিষেধ করেছে।

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান, পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ (আই.)-এর সান্নিধ্যে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলাপচারিতার একান্ত কিছু মুহূর্ত

আমরা নজিরবিহীন এক সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি,যেখানে আমরা কল্পনাতীত ভয়াবহ পরিণামবাহী এক সম্ভাব্য বৈশ্বিক সংঘাতের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। সাম্প্রতিক এক একান্ত সাক্ষাতের সময় IAAAE-এর ২০২২ সালের বার্ষিক সিম্পোজিয়ামে খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর বক্তৃতার প্রেক্ষাপটে হুযূর আকদাসকে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি এবং একটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা সম্পর্কে আমার কিছু প্রশ্ন করার সৌভাগ্যপূর্ণ সুযোগ হয়েছিল। পাঠকদের সুবিধার্থে সেই আলোচনার বিবরণ উপস্থাপিত হল:

আমের সফীর:হুযূর! আমরা IAAAE-র সম্মেলনে আপনার ভাষণ শোনার পর অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.):কোন্ অর্থে?

আমের সফীর:হুযূর! যদিও আপনি নিয়মিতভাবেই একটি নিউক্লিয়ার যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে কথা বলেছেন, এই প্রথমবারের মতো আমরা হুযূরকে এমন এক অঘটনের পরবর্তীতে কীভাবে পুনর্নির্মাণ করতে হবে তার একটি ছক সম্পর্কে কথা বলতে শুনলাম। আমি যে টেবিলে বসেছিলাম, সেখানকার মানুষ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে আফ্রিকায় জমি কেনার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। কেউ কেউ বলছিলেন যে, এখন যেহেতু পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি হচ্ছে বলে মনে হয়, আর যদি খোদা না করুন এভাবে পরিস্থিতির অবনতি চলতে চলতে এটি এক নিউক্লিয়ার সংঘাতে রূপ নেয়, তাহলে আমরা এমন ধ্বংসযজ্ঞপূর্ণ এক বৈশ্বিক বিপর্যয়ের মুখে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য মজুদ করেই বা আমরা কতটুকু লাভবান হতে পারবো?

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.): সাধারণভাবে কঠিন পরিস্থিতিতে কেউ অন্তত দুই-তিন মাসের খাদ্য ও পানীয়ের মজুদ রাখতে পারেন।কিন্তু, একটি নিউক্লিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সবচেয়ে কঠিন দৃশ্যপটে, যেখানে অত্যন্ত ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হবে- আর কীইবা বাকি থাকবে? একমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমত ছাড়া, কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকতে পারে না।

সুতরাং, প্রথমে আপনাকে দেখতে হবে নিউক্লিয়ার সংঘাতের চরম দৃশ্যপটে কী অবশিষ্ট থাকবে। যদিওবা কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী টিকে থাকে। তেজস্ক্রিয়তার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কারণে নিউক্লিয়ার যুদ্ধের পরে এমনিতেই নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে। মাটির ওপরে হোক অথবা নিচে, তেজস্ক্রিয়তা প্রবেশ করবে, আর স্বাভাবিকভাবে যেখানে মানুষ মৃত্যুবরণ করে, সেখানে উদ্ভিদও মৃত্যুর শিকার হবে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, বেশ কয়েক বছর ধরে মাটির ওপরের স্তরে তেজস্ক্রিয়তার প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকতে পারে। এরপর ধীরে ধীরে তেজস্ক্রিয় উপাদানগুলো মাটিতে শোষিত হলে এমনকি তার নিচের স্তরও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়তে পারে। কিছু বিশেষজ্ঞের মতে কয়েক বছর পরে আবার ফসল ফলানো সম্ভব হতে পারে। কয়েক ফুট মাটি সরিয়ে ফেলতে হবেএবং এরপরে নিচের মাটিতে ফসল ফলানো সম্ভব হতে পারে। তবে সেই পর্যায়ে লাগানোর উপযোগী বীজ পাওয়া যাবে কিনা তা-ও দেখার বিষয়। সংক্ষেপে, এই দৃশ্যপটটি এমন ভয়ঙ্কর ও আতঙ্কজনক হতে পারে যে, মানবজাতির পক্ষে তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কে জানে যে, এমন পরিস্থিতিতে কে বেঁচে থাকবে আর কে মৃত্যুবরণ করবে। এ কারণেই, যেমনটি বেশ কিছু সময়পার হয়ে গেল আমি সতর্ক করে আসছি, বিশ্ববাসীর টনক নড়া এবং বোধোদয় হওয়া উচিত।বলা হচ্ছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বাঙ্কার (পাতাল স্থাপনা) তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে কোনো কোনোটি ১৫ লক্ষ থেকে ৪৫ লক্ষ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এই সকল বাঙ্কার ক্রয় করছেন, যেগুলো এমনভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে যেন এটম বোমার আক্রমণ এটি সহ্য করতে পারে। কিন্তু যদি হাতে গোনা কিছু ধনাঢ্য ব্যক্তি বেঁচে যান আর বাকি সকলে, যাদের আর্থিক সঙ্গতি তেমন নেই, তারা ধ্বংস হয়ে যান তাহলে কীইবা লাভ হবে?খাদ্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যতটুকু সম্পর্ক, বর্তমানে আফ্রিকায় খাদ্য দ্রব্য রপ্তানি করা হচ্ছে, কিন্তু এমন হতে পারে যে, আফ্রিকা থেকেই আমাদের খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে। আফ্রিকায় কৃষি খামার প্রতিষ্ঠায় আমরা বিনিয়োগ করতে পারি; কেননা, আফ্রিকা এবং বিশ্বের অন্য এমন যে কোনো অঞ্চল, যা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হবে না, তারই সম্ভাবনা থাকবে বিশ্বের ভবিষ্যৎ খাদ্য ভাণ্ডারে পরিণত হওয়ার।

যখন মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন যে, "হে ইউরোপ! তুমি নিরাপদ নও, আর হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নও, আর হে দ্বীপবাসীগণ! কোন মিথ্যা খোদা তোমাদেরকে রক্ষা করতে আসবে না। আমি নগরসমূহকে ধ্বংস হতে দেখছি, আর বসতিসমূহকে জনমানব শূন্য পাচ্ছি" তখন লক্ষণীয় যে, এখানে আফ্রিকার উল্লেখ নেই। তাই আমার মন এই সম্ভাবনার দিকে যায় যে, হতে পারে আফ্রিকা মহাদেশ রক্ষা পাবে। এটি একটি চিন্তা যা মনে উদয় হয়, অথবা এমন হতে পারে যে, আফ্রিকার একটি বড় অংশ রক্ষা পাবে। সুতরাং, আমরা আফ্রিকায় বিনিয়োগ করতে পারি, কেননা ভবিষ্যতে, বিশ্ববাসীর খাবারের যোগান দিতে আফ্রিকা সহায়তা করতে পারে।

আমের সফীর:হুযূর! আপনি একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন কি আফ্রিকা কীভাবে বিশ্ববাসীকে খাদ্য যোগান দিবে, যেখানে বর্তমানে আফ্রিকার কোনো কোনো দেশের পরিস্থিতিতে মনে হতে পারে যে, এটি তাদের সাধ্যাতীত?

খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.):আফ্রিকায় বিস্তর সম্ভাবনা রয়েছে। যে ঘাটতি রয়েছে তা যথাযথ পরিকল্পনা, বিনিয়োগ এবং সততার অভাবের কারণে রয়েছে। যদি যথাযথ পরিকল্পনা এবং সততা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, আফ্রিকায় এক বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে যা বর্তমানে অব্যবহৃত। এ সম্ভাবনা উপলব্ধি করা এবং যথাযথভাবে এ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়া প্রয়োজন।

আমের সফীর:হুযূর! আপনি যেভাবে আপনার ওঅঅঅউ-এর ভাষণে উল্লেখ করেছেন, সেই পথ অনুসরণ করে অনেক প্রকৌশলী, স্থপতি, ডাক্তার এবং অন্যান্য কিছু কিছু মানুষ হুযূরের বর্ণিত পুনর্নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাজ করতে পারবেন। অন্যান্য আহমদীগণ যাদের এ ধরনের দক্ষতা নেই তারা এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে হলে কী করতে পারেন?

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.):একজন আহমদীর দোয়া করা উচিত যে, এমন দুর্ঘটনা ঘটার পূর্বেই যেন পৃথিবী রক্ষা পেতে পারে, আর যদি বা ঘটে যায় তাহলে এর পরবর্তী ক্ষতিকরপ্রভাব থেকে যেন রক্ষা পায়। আর আমরা কী করতে পারি? যখন আমরা আমাদের সামনে অন্ধকার দেখি তখন তা আমাদেরকে অন্যদের কাছে এর পরিণাম বর্ণনা করার কাজে নিয়োজিত করে। এখন কেবল আল্লাহ্‌ই বিশ্বকে রক্ষা করতে পারেন এবং এইসব মানুষের অন্তরে কিছু সুবুদ্ধির উদয় করাতে, অথবা তাদেরকে বোঝানোর বিভিন্ন প্রয়াসকে ফলদায়ক করতে পারেন। এ কারণেই আমি বিশ্ব-নেতৃবর্গকে বছর দুয়েক আগে পত্র প্রেরণ করেছিলাম এ কথা বলে যে, বিশ্বকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের বোধোদয় হওয়া উচিত এবং তাদের নিজ স্রষ্টাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। কিন্তু, তারা সতর্ক হতে বা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। বস্তুবাদিতার কাছে তারা পরাভূত এবং এখন কেবল আল্লাহ্‌র রহমতই তাদেরকে রক্ষা করতে পারে।

তবে আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, কেউ শতভাগ নিশ্চয়তার সাথে দাবি করতে পারেন না যে, তিনি জানেন কী ঘটতে চলেছে। আমরা কেবল দোয়া করতে পারি, যদি এটাই আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তবে আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করেন। আর যদি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত ভিন্ন হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ এমন করুন, বিশ্ব জুড়ে মানবতার বৃহৎ অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার মতো এমন বৃহদাকার ধ্বংসযজ্ঞ যেন টলে যায়।

এরপর ১১ পাতায়

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

জুমআর খুতবা

কোনও সেনাবাহিনীর কোনও সুযোগ্য বীর সেনাপতি এমন নিষ্ঠা , একাগ্রতা এবং বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে রাষ্ট্রনায়কের ব্যক্তিগত বৈশিষ্টাবলী এবং উন্নত চরিত্র প্রভাবিত করে।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদাবান সাহাবী এবং খলীফায়ে রাশেদ হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে বিদ্রোহী ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা।

জলসা সালানা যুক্তরাজ্যে অংশগ্রহণকারী ও কর্মীবৃন্দের জন্য দোয়ার আহ্বান।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ২৯ জুলাই , ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (২৯ওয়াফা, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর খেলাফতকালে (পরিচালিত) বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের স্মৃতিচারণ করা হচ্ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় আজ বাকি সেসকল যুদ্ধের উল্লেখ করব যেগুলো হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে লড়া হয়েছিল। যুদ্ধ-বিষয়ক সকল বিষয় আজই সমাপ্ত করার জন্য আজকের খুতবা কিছুটা দীর্ঘ হতে পারে।

(প্রথমে) হীরার যুদ্ধ। দ্বাদশ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসের প্রারম্ভে হযরত খালেদ (রা.) আমগেশিয়া থেকে হীরা অভিমুখে যাত্রা করেন।

(সীরাত সৈয়্যদানা সিদ্দীকে আকবার, প্রণেতা-উমর আবুন নাসার, পৃ: ৬৭২)

এ বিষয়ে (বর্ণিত আছে যে,) হযরত খালেদ (রা.) আমগেশিয়া থেকে হীরার অভিমুখে যাত্রা করেন। ফুরাত নদীর তীরবর্তী হীরা (নগরী) আরব খ্রিষ্টানদের প্রাচীন কেন্দ্র ছিল এবং হীরার তৎকালীন শাসক ছিল একজন ইরানী। হীরার গভর্নর আঁচ করতে পেরেছিল যে, হযরত খালেদ (রা.)-এর সৈন্যদলের দৃষ্টি এখন তার দিকেই থাকবে তাই সে হযরত খালেদ (রা.)-এর বিরুদ্ধে সমর প্রস্তুতি নেয়া শুরু করে আর সে এ-ও অনুমান করে যে, খালেদ (রা.) এদিকে আসার ক্ষেত্রে নদীপথ অবলম্বন করবে এবং নৌকাযোগে এখানে এসে পেঁ ছবে। সে তার পুত্রকে ফুরাত নদীর পানি আটকে দেয়ার আদেশ দেয় যেন খালেদ(রা.)-এর নৌবহর কাদায় আটকে যায় এবং সে স্বয়ং তার পেছন পেছন যায় এবং হীরার বাইরে নিজ সেনাদল মোতায়েন করে। হযরত খালেদ (রা.) যখন আমগেশিয়া থেকে যাত্রা করেন এবং মালামাল ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদসহ সৈন্যদলও নৌবহরে আরোহণ করানো হয় তখন (নদীর) পানির স্বল্পতার কারণে নৌকাগুলো মাটিতে আটকে যাওয়ার ফলে হযরত খালেদ (রা.) অনেকটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। মাঝিমাল্লারা বলে যে, পারস্যের অধিবাসীরা ফুরাত নদীর পানি এদিকে আসার পথে বাধ বেধে খালের দিকে খুলে দিয়েছে ফলে (ফুরাত নদীর) সকল পানি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য খাল বন্ধ না করা হবে ততক্ষণ আমাদের কাছে পানি আসতে পারবে না। একথা শুনে হযরত খালেদ (রা.) তাৎক্ষণিক অশ্বারোহী একটি যোদ্ধাদল নিয়ে শাসকেরছেলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে আতিক নদীর উপকণ্ঠে সেনাদলের একাংশের সাথে হযরত খালেদ (রা.)-এর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। হযরত খালেদ তাদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন যখন কিনা তারা একেবারেই অপ্রস্তুত ছিল। হযরত খালেদ (রা.) তাদের সবাইকে হত্যা করেন। এরপর সম্মুখে অগ্রসর হন এবং দেখেন যে, হীরার গভর্নরের পুত্র নদীর গতিপথ পরিবর্তনের তত্ত্বাবধান করছে। তিনি (রা.) তড়িৎ তার ওপর আক্রমণ করে তাকে ও তার সেনাদলকে হত্যা করেন এবং বাধ ভেঙে দিয়ে পুনরায় নদীতে পানি প্রবাহিত করেন। এরপর স্বয়ং সেখানে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ের তদারকি করতে থাকেন আর অবশেষে পুনরায় নৌবহর সফর শুরু করে।

এরপর হযরত খালেদ (রা.) নিজ সকল নেতৃস্থানীয় লোকদের একত্রিত করেন এবং খাওয়ারনাক নামক জায়গায় গিয়ে উপনীত হন। [খাওয়ারনাক ছিল হীরার নিকটবর্তী একটি দুর্গ ।] কিন্তু গভর্নর যখন জানতে পারে যে, আরদশির মারা গেছে এমনকি তার নিজের ছেলেও উক্ত যুদ্ধে নিহত হয়েছে তখন সে কোনোপ্রকার যুদ্ধ না করে ফুরাত নদী পার হয়ে পলায়ন করে কিন্তু গভর্নরের পলায়ন সত্ত্বেও হীরার অধিবাসী মনোবল হারায়নি এবং তারা দুর্গে আবদ্ধ হয়ে যায়। সেখানে ছিল চারটি দুর্গ এবং চারটি দুর্গেই আবদ্ধ হয়ে তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) নিম্নলিখিত পন্থায় দুর্গ অবরোধ করেন,আবইয়ায দুর্গ অবরোধের জন্য যেরার বিন আসগার নিযুক্ত হন। উক্ত দুর্গে আইয়াস বিন কুবায়সা তায়ী আশ্রয় নিয়েছিল। আতসিয়্যিন দুর্গ অবরোধের জন্য যেরার বিন খাতাব নিযুক্ত হন। এই দুর্গে আদি বিন আদী আশ্রয় নিয়েছিল। বনী মা'যেন দুর্গ অবরোধের জন্য যেরার বিন মুকাররিন নিযুক্ত হন। এই দুর্গে ইবনে আক্কাল আশ্রয় নিয়েছিল। ইবনে মুকায়লা দুর্গ অবরোধের জন্য মুসান্না বিন হারেসা নিযুক্ত হন। এতে আমর বিন আব্দুল মসীহ আশ্রয় নিয়েছিল।

হযরত খালেদ তার আমীরদের নামে এ প্রত্যাদেশ জারি করেন যে, তারা যেন প্রথমে ঐসকল লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেন; যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের ইসলাম গ্রহণকে যেন স্বীকৃতি দেয় আর যদি তারা (ইসলাম গ্রহণে) অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাদেরকে এক দিনের জন্য অবকাশ দেয়। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন যে, শত্রুকে কোনোরূপ সুযোগ দিবে না বরং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে আর মুসলমানদেরকে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে বাধা প্রদান করবে না।

শত্রুপক্ষ যুদ্ধ করার পথ বেছে নেয় এবং মুসলমানদের ওপর প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করে। মুসলমানরা তাদের ওপর তির বর্ষণ করা আরম্ভ করে এবং তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর প্রাসাদ ও দুর্গসমূহ জয় করে নেয়। সেখানে যেসব পাদ্রী উপস্থিত ছিল তারা চিৎকার করে বলতে থাকে, হে প্রাসাদবাসী! তোমরা ছাড়া আমাদেরকে অন্য কেউ যেন হত্যা না করতে পারে। [মূলত তাদেরকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে] প্রাসাদের অধিবাসীরা বলে, হে আরবরা! আমরা তোমাদের তিনটি শর্তের মধ্যে একটি মেনে নিয়েছি তাই তোমরা এখন অস্ত্র বিরতি দাও। তারা যখন সেখানে দেখল যে, আরবরা অর্থাৎ মুসলমানরা জয় লাভ করছে তখন তারা শর্ত সাপেক্ষে দুর্গের ফটক খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এসব প্রাসাদের সর্দাররা বাইরে বেরিয়ে আসে। এরপর হযরত খালেদ (রা.) এসব প্রাসাদের অধিবাসীদের সাথে পৃথক পৃথক বৈঠক করেন আর তাদের এহেন কৃতকর্মের জন্য তিরস্কার করেন।

(সীরাত সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়্যত ও কারনামে, প্রণেতা- আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ৪১০) (হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৩১৫) (তারিখুত তাবারী, ২য়, পৃ: ৩১৫) (মুজামুল বুলদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৯)

তিরস্কার করে বলেন, তোমাদের জন্য পরিতাপ! তোমরা নিজেদেরকে কী মনে করে আমাদের সাথে যুদ্ধ করেছ। যদি তোমরা আরব হয়ে থাক তাহলে কী কারণে তোমরা নিজেদের স্বজাতির সাথে যুদ্ধ করতে

মনস্থ করেছ? আর যদি তোমরা অনারব হয়ে থাক তাহলে তোমরা কি মনে করো যে, ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় অতুলনীয় এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরা জয়লাভ করবে? (এতে) সর্দাররা জিযিয়া (বা যুদ্ধকর) প্রদান করতে সম্মত হয়। হযরত খালেদ (রা.)-এর আশা ছিল যে, স্বজাতি হওয়ার কারণে এই ইরাকি আরব অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করবে কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিস্মিতহলেন যখন কিনা তারা যথারীতি খ্রিষ্টধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকার বিষয়ে হঠকারিতা দেখাল। যাহোক, হযরত খালেদ (রা.) হীরাবাসী এবং মুসলমানদের মাঝেঅনুষ্ঠিত চুক্তি লিখেন যা নিম্নরূপ:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটি সেই চুক্তিনামা যা হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ বনাম আদী বিন আদী, আমর বিন আদী, আমর বিন আব্দুল মসীহ, আইয়াস বিন কুবায়সা, হিরি ইবনে আক্কাল-এর মাঝে সম্পাদিত হয়েছে। এরা হীরার জননেতা এবং হীরার অধিবাসীরা এই চুক্তিতে একমত। তিনিতাদেরকে বলেন যে, তাদের সাথে এক লক্ষ নব্বই হাজার দিরহামে চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে যা প্রতি বছর তাদের নিরাপত্তা প্রদানের বিনিময় হিসেবে আদায় করা হবে।

অর্থাৎ স্থানীয় লোকদের নিরাপত্তার জন্য এই জিযিয়া আরোপ করা হয় এবং তা আদায় করা হবে যদি তাদের কাছে পার্থিব ধনসম্পদ থাকে তা সে কোন সন্ন্যাসীর কাছে হোক বা কোন পাদ্রীর কাছে তবুও (তারা জিযিয়া দিবে)। তবে যাদের কাছে কিছুই নেই, যারা জগৎবিচ্ছিন্ন তারা এর আওতাভুক্ত নয়। আর তাদের সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার শর্তে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। আর যদি তারা তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে না পারে তাহলে তাদের ওপর কোনো জিযিয়া বর্তাবে না। [মোটকথা এই গভর্নর তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।] আর যদি তারা নিজেদের কোনো কথা বা কাজে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে এই চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এই চুক্তিনামা বার হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে সম্পাদিত হয়েছিল।

উক্ত চুক্তিনামা হীরাবাসীকে হস্তান্তর করা হয় এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পর যখন সাওয়াদবাসী মুরতাদ হয়ে যায় তখন তারা এই চুক্তির অবমাননা করে এবং উক্ত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আমল করেনি আর অন্যান্যদের সাথে তারাও কুফরী করে বসে। আর (একারণে) তারা পারস্যদের অধীনস্থ হয়ে যায়। হযরত মুসান্না যখন হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালে হীরা পুনরায় জয় করেন তখন তারা উক্ত চুক্তিনামা উপস্থাপন করে কিন্তু হযরত মুসান্না তা গ্রহণ করেননি বরং তাদের ওপর অন্যান্য শর্তারোপ করেন। হযরত মুসান্না যখন বিভিন্ন স্থানে পরাজিত হন অর্থাৎ বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁকেও (কখনো কখনো) পিছপা হতে হয়েছে তখন সেসব লোকেরা পুনরায় অন্যান্য লোকদের সাথে কাফের হয়ে যায়। (তারা) বিদ্রোহীদের সাহায্য-সমর্থন করে আর চুক্তির অবমাননা করে এবং সেই চুক্তির শর্ত মেনে চলেনি। আর যখন হযরত সা'দ (রা.) হীরা জয় করেন তখন তারা পূর্ববর্তী চুক্তির ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করতে চায়, তখন হযরত সা'দ (রা.) বলেন, উভয় চুক্তির মাঝে যেকোনো একটি চুক্তিনামা উপস্থাপন করো কিন্তু তারা উপস্থাপন করতে ব্যর্থহয়। হযরত সাদ (রা.) তাদের ওপর ট্যাক্স চাপান। আর তাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য যাচাই-বাছাই করে মণি-মাণিক্য ছাড়াও চার লক্ষ (দিরহাম) ট্যাক্সধার্য করেন।

হীরা জয় করে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) নামাযে ফাতাহ্ আদায় করেন আর এক সাথে আট রাকাত পড়ে সালাম ফেরান। অর্থাৎ এক সাথে আট রাকাত আদায় করেন। নামায শেষে তিনি বলেন, মু'তার যুদ্ধে আমি যখন যুদ্ধরত ছিলাম তখন আমার হাতে নয়টি তরবারি ভেঙেছিল।আমি কখনো কোনো এমন জাতির সাথে যুদ্ধ করিনি যেমনটা এই জাতির সাথে যুদ্ধ করেছি যারা হলো পারস্যবাসীর অন্তর্গত আর আমি পারস্যবাসীর মাঝ থেকে কারো সাথে এমন যুদ্ধ করিনি যেমনটি উলায়েসবাসীর সাথে করেছি।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৬-৩১৯)

এছাড়া বর্ণিত হয়েছে, তারা হযরত খালেদ (রা.)-এর জন্যবিভিন্ন উপঢৌকনও প্রেরণ করে কিন্তু হযরত খালেদ (রা.) বিজয়ের সুসংবাদের সাথে সেসব উপঢৌকনও হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.)-ও ন্যায়বিচার ও সুবিচারের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করে সেই উপঢৌকনসমূহ জিযিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে গ্রহণ করেছিলেন। আর হযরত খালেদ (রা.)-কে লিখেন যে, এগুলো জিযিয়া কর বলে পরিগণিত হলে ঠিক আছে, তা না হলে এগুলোকে জিযিয়া কর হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে অবশিষ্ট জিযিয়া গ্রহণ করো। অর্থাৎ উপঢৌকনরূপে গ্রহণ করেননি বরং জিযিয়া হিসেবে গ্রহণ করেন। মুসলমানরা হীরার স্থানীয় অধিবাসীর সাথে উদার আচরণ করেন। এই ব্যবহার দেখে আশেপাশের জমিদার ও নেতারাও জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয় এবং মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নেয়।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৩১৮-৩১৯)

হীরা বিজয় সুমহান সামরিক গুরুত্বের ধারক-বাহক প্রমাণিত হয়েছে।

এর ফলে মুসলমানদের দৃষ্টিতে পারস্য বিজয়ের সম্ভাবনা বেড়ে যায় কেননা ইরাক এবং পারস্য সাম্রাজ্যের জন্য ভৌগলিক এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই শহরের বেশ গুরুত্ব ছিল। এই শহরকে ইসলামী সৈন্যদলের সর্ব মহান সেনাপতি নিজের কেন্দ্র এবং রাজধানী আখ্যা দেন যেখান থেকে ইসলামী সেনাবাহিনীকে আক্রমণ রচনা ও প্রতিরক্ষা আর অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা ও গণকল্যাণের আদেশ জারি করা হতো আর যুদ্ধবন্দি সংক্রান্ত আইন-কানুন বিষয়ক পরিকল্পনা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্রস্থল করেন আর সেখান থেকে হযরত খালেদ (রা.) খাজনা ও জিযিয়া আদায় করার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। অনুরূপভাবে সীমান্তে (পাহারাদারদের জন্য)কর্মকর্তাদের নিয়োগ করেন যাতে করে শত্রু থেকে নিরাপদ থাকা যায়। তিনি স্বয়ং সেখানে অবস্থান করে শান্তি ও শৃঙ্খলা বহালের কাজে মনোনিবেশ করেন। তাঁর এসব কার্যক্রমের সংবাদ জায়গিরদার ও সরদাররা অবগত হলে তারাও তাঁর (রা.) সাথে সন্ধি করার জন্য এগিয়ে আসে। যখন তারা দেখে যে, এই (মুসলমানরা) বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজয় লাভ করছে তখন তারা সন্ধিচুক্তি করে। ইরাকের গণমানুষ এবং এর আশপাশের এমন কেউ বাকি থাকল না যারা মুসলমানদের সাথে আপোষ বা সন্ধিচুক্তি না করেছে।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়্যত অউর কারনামে, প্রণেতা- ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ৪১২)

হযরত খালেদ (রা.) এক বছর পর্যন্ত হীরায় অবস্থান করেন। সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে পাহাড়ি ও নীচু অঞ্চলে সফর করতে থাকেন। এদিকে পারস্যবাসীরা বাদশাহ বানাতে থাকে আর অপসারণ করতে থাকে।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড,পৃ: ৩২১)

অর্থাৎ এর (তথা মুসলমানদের এমন সুচারু কর্মকাণ্ডের) বিপরীতে পারস্যবাসী কী করেছে? সেখানে একদিকে বাদশাহ হতে থাকে আবার অপসারিত হতে থাকে। ইরাকের পরিবেশ যখন অনুকূল হয়ে যায় আর হীরা ও দাজলার মাঝে আরব এলাকা থেকে পারস্যের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ফলে আর কোন আশঙ্কা বাকি রইল না। তখন হযরত খালেদ (রা.) সরাসরি ইরানের ওপর আক্রমণ করার সংকল্প করেন। সেই সময় ইরানী সম্রাট আরদশির মারা যাওয়ায় ইরান সাম্রাজ্য নৈরাজ্যের শিকার হয়। তাদের মাঝে স্থলাভিষিক্ত নির্বাচনের বিষয় নিয়ে বিরাট মতবিরোধ দেখা দেয়। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হযরত খালেদ (রা.) তাদের বাদশাহ, আমীর ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের কাছে পত্র লিখেন। সেই বাদশাহদের লিখতে গিয়ে লিখেন, খালেদ বিন ওয়ালিদের পক্ষ থেকে পারস্যের বাদশাহদের নামে এই পত্র লেখা হচ্ছে। আম্মাবাদ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার জন্য যিনি তোমাদের ব্যবস্থাপনাকে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছেন। যিনি তোমাদের কূটচাল ব্যর্থ করে দিয়েছেন, তোমাদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তোমাদের শক্তি দুর্বল করে দিয়েছেন। তোমাদের সম্পদ কেড়ে নিয়েছেন। তোমাদের বিজয় এবং সম্মানকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছেন। তাই তোমরা আমার এই চিঠি পেলে ইসলাম গ্রহণ করবে; এতে তোমরা নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে অন্যথায় চুক্তি করে জিযিয়া বা কর দিতে সম্মত হয়ে যাও। ইসলাম গ্রহণ করতে না চাইলে সন্ধিচুক্তি করো এবং রাজস্ব দিতে সম্মত হও। যদি এমনটি করো তাহলে আমরা তোমাদেরকে এবং তোমাদের অঞ্চল ছেড়ে অন্যদিকে চলে যাব।

নতুবা আল্লাহ্র কসম! যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, আমি এমন সেনাদল নিয়ে তোমাদের নিকট আসব যারা মৃত্যুকে সেভাবে ভালোবাসে যেভাবে তোমরা জীবনকে ভালোবাস আর পরকালের প্রতি সেভাবে আকর্ষণ রাখে যেরূপ তোমাদের জগতের প্রতি আসক্তি রয়েছে। এছাড়া ইরানী শাসক এবং নেতৃবৃন্দকে লিখিত পত্রে বলেন, খালেদ বিন ওয়ালিদের পক্ষ থেকে পারস্যের আমীরদের নামে পত্র। এই পত্র খালেদ বিন ওয়ালিদের পক্ষ থেকে ইরানের শাসক ও আমীরদের নামে- তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, নিরাপদ থাকবে অথবা রাজস্ব প্রদান করো তাহলে আমরা তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবো। অন্যথায় মনে রেখ! আমি এমন জাতি নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছি যারা মৃত্যুকে ততটাই ভালোবাসে যতটা তোমরা মদপানকে (ভালোবাস)।

হীরা বিজয়ের ফলে ইরাক জয় এবং সেটিকে ইসলামী সাম্রাজ্যের অধীনস্থ করা সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইচ্ছার একাংশ পূর্ণতা পায় যা মূলত ইরানের ওপর সরাসরি আক্রমণের অবতরণিকা ছিল। হযরত খালেদ (রা.) এক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেন আর স্বল্প সময়ের মধ্যেই হীরায় পৌঁছে যান কেননা ইরাকের বিরুদ্ধে তার অভিযানের সূচনা হয়েছিল দ্বাদশ হিজরীর মহররম মাসে কাযেমা যুদ্ধের মাধ্যমে আর একই বছরে অর্থাৎ,দ্বাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হীরা বিজিত হয়।

এরপর 'আম্বার' বা 'যাতুল উয়ুন'-এর যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে যা দ্বাদশ হিজরীতে সংঘটিত হয়। ইরানী সেনাবাহিনী হীরার অদূরে আম্বার এবং আইনুত্ তামারে শিবির স্থাপন করেছিল। আম্বারও বালাখের নিকটবর্তী একটি শহর। আম্বার নামকরণের কারণ হিসেবে লেখা আছে, আরবী ভাষায় ফসল ও সাজসরঞ্জাম রাখার কক্ষকে আম্বার বলে। আর এই শহরকে আম্বার বলার কারণ হলো, সেখানে বিপুল পরিমাণে পানাহার সামগ্রী সংরক্ষিত ছিল। আম্বারের নিকটবর্তী কুফার পশ্চিমে অবস্থিত একটি শহর হলো আইনুত্ তামার।

লিখা আছে, সেসব স্থানে ইরানী সেনাদের উপস্থিতির কারণে ইসলামী বাহিনীর চরম কষ্ট হয়েছিল। এমতাবস্থায় হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) যদি নীরবে হীরায় বসে থাকতেন এবং বাইরে বেরিয়ে ইরানী সেনাদলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ না করতেন তাহলে আশঙ্কা ছিল যে, এই অঞ্চল মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যাবে যেটিকে তারা জয় করেছিল যা অনেক কষ্টের পর তাদের হস্তগত হয়েছিল। কাজেই হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ সৈন্যদলকে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দেন।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়্যত অউর কারনামে, প্রণেতা- ডক্টর আলি মহম্মদ আস সালাবী, পৃ: ৪১৩) (হযরত আবু বাকার সিদ্দীকে আকবার,পৃ: ২৮৭) (আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪৫) (আল মুনজাদ) (মুজামুল বুলদান,১ম খণ্ড, পৃ: ৩০৫, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯৯)

হীরা এবং এর চতুর্দিকের অবস্থা যখন (মুসলমানদের) নিয়ন্ত্রণে চলে আসে আর সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন হযরত খালেদ (রা.) হীরায় হযরত কা'কা বিন আমর তামিমীকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে স্বয়ং হযরত আইয়ায বিন গানামকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হযরত আইয়ায বিন গানামকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) উত্তর থেকে ইরাক জয়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন এবং তাকে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদের সাথে গিয়ে মিলিত হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়্যত অউর কারনামে, প্রণেতা- ডক্টর আলি মহম্মদ আস সালাবী, পৃ: ৪১৬)

আম্বারের সৈন্যদলের সেনাপতি ছিল সাওয়াত-এর নেতা শীরাযায। সে তার যুগে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সম্মানিত এবং আরব-অনারব সবার মাঝে সর্বজনপ্রিয় একজন অনারব ছিল। সাওয়াতও মিদিয়ানের প্রসিদ্ধ একটি জায়গার নাম। যাহোক, লিখা আছে আম্বারবাসী দুর্গাবদ্ধ হয়ে যায় এবং তারা দুর্গের চতুর্দিকে পরিখা খনন করে রেখেছিল যা পানিতে পরিপূর্ণ করা হয়েছিল আর এই পরিখা দুর্গের প্রাচীরের খুবই নিকটে ছিল। কোনো মুসলমান এর নিকটবর্তী হলেই দুর্গের প্রাচীরের ওপর নিযুক্ত বিরোধী সৈন্যরা তীব্র তির নিক্ষেপের মাধ্যমে মুসলমানদের পিছু হটতে বাধ্য করত। তাদের এমতাবস্থায় হযরত খালেদ তার সেনাদলের সম্মুখসারিকে নিয়ে সেখানে পৌঁছান। তিনি পরিখার চতুর্দিকে একবার প্রদক্ষিণ করেন এবং দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন আর স্বীয় খোদাপ্রদত্ত দূরদৃষ্টির ভিত্তিতে একটি পরিকল্পনা করেন। হযরত খালেদ (রা.) তার তিরন্দাজদের নিকট যান এবং এক হাজার তিরন্দাজ নির্বাচিত করেন- যারা অব্যর্থ লক্ষ্যভেদকারী ছিল। তাদেরকে নির্দেশনা দিয়ে বলেন, আমি লক্ষ্য করছি এরা রণনীতি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। তোমরা শুধুমাত্র তাদের চোখগুলোকে তোমাদের তিরের লক্ষ্যে পরিণত করো এবং এছাড়া অন্য কোথাও তির নিক্ষেপ কোরো না। অতএব তারা একসঙ্গে তির নিক্ষেপ করে এবং এরপর কয়েকবার এমনটিই করেন। যার ফলে সেদিন প্রায় এক হাজার চোখ নষ্ট হয়েছিল। একারণেই এ যুদ্ধটি 'যাতুল উয়ু ন' অর্থাৎ চোখের যুদ্ধ নামেও প্রসিদ্ধ।

শত্রুদের মাঝে হৈচৈ পড়ে যায় যে, আম্ব ারবাসী অন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এতদসত্ত্বেও আম্বারের শাসক নিঃশর্ত অস্ত্র সমর্পণ করতে ইতস্তত করে। তখন হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) নিজ বাহিনীর কয়েকটি দুর্বল ও ক্লান্ত উট সাথে নিয়ে পরিখার সবচেয়ে সরু স্থানে আসেন। এরপর উটগুলো জবাই করে পরিখার ভেতরে ফেলে দেন যেকারণে তা ভরে যায় এবং সেই পশুগুলোর মাধ্যমে একটি সেতু নির্মিত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় মুসলমান ও মুশরিকরা পরিখার মধ্যে পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থান করছিল। এটি দেখে শত্রুরা পিছু হটে দুর্গাবদ্ধ হয়ে যায়। অতএব আম্বারের শাসক শীরাযায অবশেষে সন্ধির নিমিত্তে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদের নিকট পত্র প্রেরণ করে এবং নিবেদন করে যে, একদল আরোহীসহ যাদের সাথে কেনো প্রকার জিনিসপত্র থাকবে না- এখান থেকে বেরিয়ে নিজ গন্তব্যে ফেরার অনুমতি দেওয়া হোক। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) অনুমতি প্রদান করেন।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, যেসব ঐতিহাসিক এবং জীবনীকারক হযরত খালেদ (রা.)-এর ওপর এ অপবাদ আরোপ করে যে, হযরত খালেদ বর্বরতা ও হিংস্রতার বাজার গরম করে রেখেছিলেন আর নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালাতেন। তাদের জন্য এটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, প্রবল যুদ্ধ করার ও বারংবার সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ না করা সত্ত্বেও শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ী হবার পরও শত্রু যখন এখান থেকে যাওয়ার অনুমতি চায় তখন তিন দিনের রসদসহ যাবার অনুমতিও প্রদান করেন এবং কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি। কাজেই, তার বিরুদ্ধে যে অপবাদ আরোপ করা হয়, তিনি অত্যাচারী ছিলেন- এটি তার জবাব।

শীরাযায যখন এখান থেকে প্রাণ রক্ষা করে বাহমান জাযভিয়াহ্'র নিকট পৌঁছে এবং তাকে সকল ঘটনা সম্পর্কে অবগত করলে সে শীরাযাযকে ভর্ৎসনা করে। তখন শীরাযায বলে, আমি সেখানে এমন লোকদের মাঝে ছিলাম যারা ছিল বুদ্ধিভ্রষ্ট ও আরব বংশোদ্ভূত। সে মুসলমানদের প্রতি ইঙ্গিত করেনি বরং আম্বারবাসীর মধ্য হতে আরব গোত্রের লোকদের প্রতি ইশারা ছিল, যারা কিছুই জানতো না। শীরাযায বলে, আমি শুনেছি মুসলমানরা নিজেদের প্রাণের মায়া না করে আমাদের ওপর আক্রমণে উদ্যত আর যখনই কোনো জাতি নিজের প্রাণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে কাজ করে তখন বিজয় তাদের জন্য অবধারিত হয়ে যায়। অতএব আমাদের সৈন্যদের সাথে যখন তাদের মোকাবিলা হয় তখন তারা আমাদের দুর্গ ও স্থলবাহিনীর মধ্য হতে এক হাজার সৈন্যের চোখ নষ্ট করে। এতে আমি বুঝতে পারি, সন্ধি করাই শ্রেয়। যখন হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ ও সকল মুসলমান আম্বারের অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হন আর আম্বারবাসীও নির্ভয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে তখন হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) লক্ষ্য করেন, তারা আরবী ভাষায় লেখাপড়া করে। তখন হযরত খালেদ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কারা? তারা বলে, আমরা আরবেরই একটি গোত্র আর আমরা এখানে সেসব আরবের কাছে এসেছিলাম যারা আমাদের পূর্বেই এখানে বসবাস করছিল। আর তারা প্রথম আরব যারা নবুখত নযরের যুগে এসেছিল, যখন সে আরবদের বসতি গড়ার অনুমতি প্রদান করেছিল, এরপর (তারা) এখানেই থেকে যায়। হযরত খালেদ (পুনরায়) জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কার কাছে লেখা শিখেছ? তারা বলে, আমরা আরব গোত্র 'বনু আয়াত'-এর কাছ থেকে শিখেছি। এরপর হযরত খালেদ আম্বারের চতুষ্পার্শ্বের লোকদের সাথেও সন্ধি করেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২২-৩২৩)(মুজামুল বুলদান, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২০৯)

এরপর 'আইনুত্ তামার'-এর যুদ্ধও দ্বাদশ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে, হযরত খালেদ (রা.) যখন আম্বার জয়ের কাজ শেষ করেন এবং তা পুরোপুরি তার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে তখন তিনি এর নিকটবর্তী অঞ্চল আইনুত্ তামার (অভিমুখে) যাত্রার সংকল্প করেন যা ইরাক ও সিরিয়ার মরুভূমির মধ্যখানে মরুপ্রান্তরে অবস্থিত। আম্বার থেকে আইনুত্ তামার পৌঁছতে তিনদিন লেগে যায়। ইরানীদের পক্ষ থেকে সেখানকার শাসক ছিল মেহরান বিন বাহযাম। সে অনারবদের একটি বিশাল সেনাবহরসহ সেখানে উপস্থিত ছিল। ইরানী সেনাদল ছাড়া আরবের বিভিন্ন বেদুঈন গোত্রও সেখানে উপস্থিত ছিল, যাদের নেতা ছিল আক্কাহ্ বিন আবী আক্কাহ্ । তারা যখন হযরত খালেদ সম্পর্কে জানতে পারে তখন আক্কাহ্ মেহরানকে বলে, আরবরা আরবদের সাথে কীভাবে যুদ্ধ করতে হয় তা খুব ভালোভাবে জানে। কাজেই, আমাদের ও খালেদকে ছেড়ে দাও। তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, তাদের সাথে (কীভাবে) যুদ্ধ করবো তা আমাদের জানা আছে। মেহরান বলে, তুমি ঠিক বলেছ। আরবদের সাথে যুদ্ধ করতে তোমরা সেভাবেই পারদর্শী যেভাবে আমরা অনারবদের সাথে যুদ্ধ করতে পারদর্শী। এভাবে সে আক্কাহ্কে প্রতারিত করে এবং এই কৌশলে নিজেকে রক্ষা করে। সে (আরো) বলে, তুমি তাদের সাথে যুদ্ধ করো; যদি তোমার আমাদের প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব। হযরত খালেদকে মোকাবিলা করার জন্য আক্কাহ্ যখন চলে যায় তখন অনারবরা আক্কাহ্ সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহার করে মেহরানকে বলে, তোমাকে তার সাথে একথা বলতে কিসে প্ররোচিত করেছিল? সে বলে, আমাকে ছেড়ে দাও; আমি তাই চেয়েছি যা তোমাদের জন্য উত্তম এবং

মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ সম্পর্কে বলে, নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে সেই লোক আসছে যে তোমাদের বাদশাহ্‌দেরও হত্যা করেছে। অনেক দুর্ধর্ষ সেনাপতি এবং তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে পদতলে পিষ্ট করেছে। কাজেই, আমি তার মোকাবিলায় আক্কাহ্‌কে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করেছি মাত্র। সে যদি খালেদের মোকাবিলায় জয় লাভ করে তাহলে এই জয় তোমাদেরই হবে আর ঘটনা যদি এর বিপরীত ঘটে তাহলে তোমরা মুসলমানদের মোকাবিলায় তখন যাবে যখন তারা দুর্বল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করলে আমরা থাকব শক্তিশালী এবং তারা হবে দুর্বল। একথা শুনে তারা মেহরানের সিদ্ধান্তেরশ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেয়। মেহরান সেই আইনুত্ তামারেই অবস্থান করে আর আক্কাহ্ হযরত খালেদের মোকাবিলার জন্য পথিমধ্যে শিবির স্থাপন করে।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ২৮৮-২৮৯) (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৪)

আক্কাহ্ তখনও তার সেনাসারি সুবিন্যস্ত করছিল এরমধ্যেই হযরত খালেদ স্বয়ং তার ওপর আক্রমণ করে এবং তাকে বন্দি করে। তার সৈন্যরা যুদ্ধ না করেই পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশকে আটক করা হয়।

মেহরানের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে সে তার সেনাদল নিয়ে পলায়ন করে এবং দুর্গ ছেড়ে দেয়। পরাজিতরা যখন সেই দুর্গে পৌঁছে তাতে আশ্রয় নেয় এবং হযরত খালেদ তাদের অবরুদ্ধ করেন, তখন তারা হযরত খালেদের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে; কিন্তু তিনি নিরাপত্তা দিতে অস্বীকার করেন। তারা তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অস্ত্রসমর্পণ করে এবং তিনি তাদেরকে বন্দি করেন। আক্কাহ্ ও যারা তার সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেছিল তাদের সবাইকে হত্যা করেন এবং যারা দুর্গে ছিল তাদেরকে আটক করেন। যেসব সামগ্রী দুর্গে সংরক্ষিত ছিল তা মালে গনিমত হিসেবে নিয়ে নেন। তিনি তাদের গির্জার ভেতর চল্লিশজন যুবককে পান যাদেরকে খ্রিষ্টানরা জিম্মি করে রেখেছিল। এই ছেলেদের অধিকাংশই ছিল আরব বংশোদ্ভূত। ইসলামের ইতিহাসে এসব যুবককে গুরুত্ব প্রদানের কারণ হলো, তাদের সন্তানদের মধ্যে এমন নামিদামি ব্যক্তিত্ব জন্ম নিয়েছেন যারা সেই যুগ এবং পরবর্তী যুগের ইতিহাসে গভীর ও অম্লান ছাপ রেখে গেছেন। এই যুবকদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন সিরীনের পিতা সিরীন, মূসা বিন নুসায়ের-এর পিতা নুসায়ের এবং হযরত উসমানের মুক্ত ক্রীতদাস হুমরানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সিরীন ইরাকের অধিবাসী ছিলেন, আইনুত্ তামারের যুদ্ধে বন্দি হয়েছিলেন এবং হযরত আনাস বিন মালেকের দাস ছিলেন। তিনি অনেক বড়কারিগর। হযরত আনাসের সাথে চুক্তিনামা করে তিনি মুক্ত হয়েছিলেন। তার পুত্রের নাম ছিল মুহাম্মদ বিন সিরীন, যিনি প্রসিদ্ধ তাবেঈ ছিলেন এবং তফসীর, হাদীস, ফিকাহ্ ও স্বপ্নের ব্যখ্যা ইত্যাদি জ্ঞানের ইমাম ছিলেন। এই মুহাম্মদ বিন সিরীন তার পুত্র ছিলেন যাকে যুদ্ধে বন্দি বানানো হয়েছিল; পরে তিনি স্বাধীন হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর ছিলেন নুসায়ের, তিনি মূসা বিন নুসায়েরের পিতা ছিলেন, তিনি বনু উমাইয়ার বন্দিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বনু উমাইয়ার কোন ব্যক্তি তাকে স্বাধীন করিয়েছিল। তিনি তার পুত্র মূসার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মূসা বিন নুসায়ের উত্তর আফ্রিকায় খ্যাতি লাভ করেন এবং তারেক বিন যিয়াদের সাথে যুক্ত হয়ে স্পেনে ইসলামী রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় অনেক বড় ভূমিকা রেখেছিলেন। এছাড়া হুমরান বিন আবানও আইনুত্ তামারের যুদ্ধবন্দিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ইহুদি ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত উসমান (রা.) তাকে স্বাধীন করিয়েছিলেন।

তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর বিশেষ নৈকট্যভাজন ছিলেন। ৪১ হিজরী সনে তিনি কিছু দিনের জন্য বাসরার শাসক হন এবং পরবর্তীতে বনু উমাইয়ার রাজত্বকালে তিনি অনেক সুনাম অর্জন করেন। হযরত খালেদ (রা.) বিজয়ের সুসংবাদ ও খুমুস (বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) এর এক পঞ্চামাংশ হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে প্রেরণ করেন।

(আল কামিলু ফিততারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪৬)(সীয়ারুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২৭৭-২৭৮) (ফুতুহুল বুলদান, পৃ: ৩২৫) (তারিখুত তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬৯. ৫৬৪)

আম্বার ও আইনুত্ তামার বিজয়ের পর হযরত খালেদ (রা.) ওয়ালিদ বিন উকবাকে (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের) এক পঞ্চমাংশ এবং বিজয়ের সুসংবাদসহ হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। মদিনায় পৌঁছার পর তিনি তাঁকে সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত করেন এবং বলেন, খালেদ (রা.) তাঁর নির্দেশাবলী উপেক্ষা করে হীরা ত্যাগ করার পর আম্বার ও আইনুত্ তামারে আক্রমণ করার কারণ হলো, হীরাতে তার অবস্থানের এক বছর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন, হীরাতেই অপেক্ষা করবে। কিন্তু যাহোক তিনি এটি করেন। সেই অবস্থায় এটিকেই তিনি উত্তম মনে করেছেন। এছাড়া আইয়্যাযের কোনো খবর ছিল না যে, তিনি কবে দুমাতুল জান্দালের কাজ শেষ করে খালেদ (রা.)-এর সাহায্যের জন্য হেরায় পৌঁছাবেন। বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। আইয়্যায সেখানে পৌঁছাচ্ছিলেন না। হযরত আবু বকর (রা.)ও আইয়্যাযের মন্থর গতির কারণে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন আর তাঁর ধারণা ছিল, তিনি মুসলমানদের মনোবল দুর্বল করছেন। শত্রুরা যদি খালেদ (রা.) -এর সেসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত হতো যা তিনি ইরাকে সম্পাদন করেছিলেন তাহলে অবশ্যই তারা আইয়্যাযের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মুসলমানদের ভীষণ ক্ষতি করত।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক আকবর, মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৩২৫)

'দুমাতুল জান্দাল'-এর যুদ্ধও দ্বাদশ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছে। দুমাতুল জান্দাল দামেস্ক থেকে ৫ রাত এবং মদিনা থেকে ১৫ রাতের দূরত্বে

অবস্থিত একটি শহর। অর্থাৎ সেযুগের ভ্রমণ-মাধ্যমের নিরিখে (এ হিসাব ছিল)। সিরিয়ার এ শহরটি মদিনার সবচেয়ে কাছের শহর। হযরত আবু বকর (রা.) যাকে দুমা-তে প্রেরণ করেছিলেন সেই হযরত আইয়্যায বিন গানাম (রা.)-কে দীর্ঘকাল থেকে শত্রুপক্ষের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। এজন্য তিনি হযরত খালেদ (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন নি। হযরত খালেদ (রা.) যখন ওয়ালিদ বিন উকবাকে আইনুত্ তামার যুদ্ধজয়ের সংবাদ দিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে প্রেরণ করেন তখন হযরত আইয়্যায (রা.)-এর বিষয়ে হযরত আবু বকর (রা.) চিন্তিত হয়ে পড়েন। কাজেই তিনি (রা.) ওয়ালিদ বিন উকবাকে আইয়্যায (রা.)-এর সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন।

(আবু বাকার আস সিদ্দীক আওয়ালুল খোলাফা আর রাশেদীন, প্রণেতা- পৃ: ১২৪)

হযরত আইয়্যায (রা.)-এর নিকট পৌঁছার পর ওয়ালিদ বিন উকবা দেখেন, হযরত আইয়্যায (রা.) শত্রুদের ঘিরে রেখেছেন এবং শত্রুরাও তাকে ঘিরে রেখেছে আর তার পথ আটকে রেখেছে। ওয়ালিদ বিন উকবা হযরত আইয়্যায (রা.)-কে বলেন, অনেক সময় শত্রুদের আধিক্যের বিপরীতে একটি বুদ্ধির কথা অধিক কার্যকর সাব্যস্ত হয়। আপনি খালেদ বিন ওয়ালিদ(রা.)-এর নিকট দূত প্রেরণ করে তার কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে নিন। ওয়ালিদের কথা মানা ছাড়া হযরত আইয়্যাযের কাছে কোন বিকল্প ছিল না। কেননা দুমাতুল জান্দাল পৌঁছার পর তার এক বছর পার হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তখনও বিজয়ের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। ফলে হযরত আইয়্যায তেমনই করেন। তার বার্তাবাহক যখন সাহায্য চাওয়ার জন্য হযরত খালেদ (রা.)-এর নিকট পৌঁছেন তখন আইনুত্ তামার জয় হয়ে গিয়েছিল। হযরত আইয়্যায (রা.)-এর নামে একটি সংক্ষিপ্ত পত্র দিয়ে দূতকে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন যাতে তাদের দুশ্চিন্তা কিছুটা লাঘব হয়। পত্রে লিখেছেন, একটু অপেক্ষা করুন। (খুব শীঘ্রই) আপনার নিকট এমনসব বাহন পৌঁছবে যেগুলোতে বাঘ আরোহিত থাকবে এবং তরবারিগুলো দ্যুতি ছড়াবে আর দলে দলে সৈন্য পৌঁছাবে। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর দুমাতুল জান্দাল আভিমুখে যাত্রা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, হযরত খালেদ আইনুত্ তামার বিজয়ের পর সেখানে ওয়ায়েম বিন কাহেল আসলামিকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন এবং নিজে তার সেই সেনাবাহিনী নিয়ে দুমাতুল জান্দাল অভিমুখে যাত্রা করেন যারা আইনুত্ তামারে ছিল। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তিনশ মাইল দূরত্ব দশ দিনেরও কম সময়ে অতিক্রম করেন।

দুমার অধিবাসীরা হযরত খালেদের আগমনের সংবাদ পেয়ে তাদের মিত্র গোত্রগুলোর কাছে সাহায্য চায়। এই গোত্রগুলো তাদের সাথে আরো কিছু গোত্রকে যুক্ত করে দুমাতুল জান্দালে পৌঁছে। তাদের সংখ্যা ঐ সময় থেকে কয়েকগুণ বেশি ছিল যখন এক বছর পূর্বে হযরত আইয়্যায (রা.) তাদের দমন করার জন্য গিয়েছিলেন। দুমাতুল জান্দালের সেনাবাহিনী দুটি বড় অংশে বিভক্ত ছিল।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ২৯০-২৯১) (তারিখুত তাবারী, প্রণেতা- আবু জাফার মহম্মদ বিন হারীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৪-৩২৫) (সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক শখসিয়্যাত অউর কারনামে, প্রণেতা- আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ৪১৮)

সৈন্যদের দুজন নেতা ছিলেন। একজন উকায়দার বিন আব্দুল মালেক এবং আরেকজন জুদী বিন রাবিয়্যা। হযরত খালেদের আগমনের সংবাদ পাওয়ার পর তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। উকায়দার বলে, আমি

খালেদকে খুব ভালোভাবে জানি। তার চেয়ে সফল ব্যক্তি আর কেউ নেই এবং যুদ্ধে তার চেয়ে তেজস্বীও কেউ নেই। যে জাতিই খালেদের সাথে লড়াই করে তারা সংখ্যায় কম হোক বা বেশি অবশ্যই পরাজিত হয়। তোমরা আমার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করো এবং তাদের সাথে সন্ধি করে নাও। কিন্তু তারা তার কথা মানতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন উকায়দার বলে, আমি খালেদের বিরুদ্ধে তোমাদের সঙ্গী হয়ে লড়তে পারব না। তোমরা যা খুশি করো। একথা বলে সে সেখান থেকে চলে যায়। হযরত খালেদ বিষয়টি অবগত হন। তিনি তার পথরোধ করার জন্য আসেম বিন আমরকে প্রেরণ করেন। সে সন্ধিতে সম্মত হয়নি, বরং সেখান থেকে প্রস্থান করে স্বীয় অঞ্চলের দিকে চলে যাচ্ছিল। আসেম উকায়দারকে ধরে ফেলেন। সে বলে, তুমি আমাকে তোমার আমীর খালেদের কাছে নিয়ে চল। হযরত খালেদ (রা.)-এর সামনে তাকে উপস্থাপন করা হলে উকায়দারকে তিনি হত্যা করান এবং তার সমুদয় সম্পদ করায়ত্ব করে নেন।

(তারিখুত তাবারী, প্রণেতা-আবু জাফর মহম্মদ বিন হারীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৫)

এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, উকায়দারকে বন্দি করার পর কেন হত্যা করা হয়েছিল? এর যে কারণ বর্ণিত হয়েছে তা হলো, তবুকের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) হযরত খালেদকে উকায়দারের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাকে বন্দি করে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী (স.) দয়া করে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং তার সাথে সন্ধিচুক্তি লিখিয়েছিলেন। কিন্তু এরপর সে চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং মদিনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৩২৭-৩২৮)

উকায়দার হযরত খালেদ (রা.)-এর দুমাতুল জান্দালে আসার সংবাদ পাওয়ার পর সে তার জাতির সঙ্গ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ে। হযরত খালেদ দুমাতুল জান্দালের পথে তার ব্যাপারে সংবাদ পান, যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য তিনি আসেম বিন আমরকে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে গ্রেপ্তার করেন এবং তার বিগত বিশ্ব াসঘাতকতার জন্য হযরত খালেদ তাকে হত্যা করার আদেশ দেন এবং তাকে হত্যা করা হয়। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে তার খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ধ্বংস করেন।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক শখসিয়্যত অউর কারনামে, প্রণেতা- ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ৪১৯)

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে আরো জানা যায়

যে, তাকে বন্দি করে মদিনায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং হযরত উমর (রা.) -এর যুগে সে মুক্তি পায় আর সে মদিনা থেকে ইরাক চলে যায়। সেখানে আইনুত্ তামারের দুমা অঞ্চলেই সে বসবাস করা আরম্ভ করে এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করে।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৩২৮) এ দুটি রেওয়ায়েতই রয়েছে।

দুমাবাসীর সাথে লড়াইয়ের ঘটনা, যাহোক লেখা আছে হযরত খালেদ দুমায় পৌঁছেন। হযরত খালেদ (রা.) দুমাকে নিজের এবং হযরত আইয়্যাযের সেনাদলের মাঝে নিয়ে নেন। যেসব আরবীয় খ্রিষ্টান দুমাবাসীর সাহায্যের জন্য এসেছিল তারা বাইরে দুর্গের চারপাশে ছিল। কেননা দুর্গেতাদের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। হযরত খালেদ ধীরেসুস্থে সেনাদের সারিবদ্ধ করার পর দুমার নেতারা দুর্গ থেকে বেরিয়ে হযরত খালেদের ওপর আক্রমণ করে। দুপক্ষের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ হয়। পরিশেষে হযরত খালেদ ও হযরত আইয়্যায (রা.) তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করেন। হযরত খালেদ জুদী এবং হযরত আকরা বিন হাবেস-কে গ্রেপ্তার করেন যে কালব গোত্রের সর্দার ছিল। অন্যরা পলায়ন করে দুর্গে আশ্রয় নেয়। তবে দুর্গে পর্যাপ্ত জায়গা ছিল না। দুর্গ ভরে গেলে ভিতরের লোকেরা অনেক লোককে বাইরে রেখেই দুর্গের দরজা বন্ধ করে দেয়। একারণে বাইরের লোকেরা দিশেহারা হয়ে ঘুরতে থাকে। তখন আসেম বিন আমর বলেন, হে বনু তামীম! তোমরা তোমাদের মিত্র কালব গোত্রের সাহায্য করো এবং তাদেরকে আশ্রয় দাও, কেননা তাদেরকে সাহায্য করার এমন সুযোগ তোমরা আর কখনোই পাবে না। একথা শুনে বানু তামীম তাদেরকে সাহায্য করে। আসেমের নিরাপত্তা প্রদানের কারণে সেদিন কালব গোত্র প্রাণে বেঁচে যায়। হযরত খালেদ দুর্গের দিকে পলায়নকারী লোকদের পিছু ধাওয়া করেন এবং এত মানুষকে হত্যা করেন যে, তাদের লাশের সংখ্যাধিক্যের কারণে দুর্গের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর জুদী এবং তার সাথে অন্যান্য বন্দিকেও হত্যা করেন। কেবল কালব গোত্রের বন্দিরা রক্ষা পায়। কারণ আসেম, আকরা এবং বনু তামীম বলে দিয়েছিল, আমরা তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেছি। এরপর হযরত খালেদ দুর্গের দরজায় ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই দরজা তিনি ভেঙেই ক্ষান্ত হন। মুসলমানরা দুর্গে প্রবেশ করে আর যোদ্ধাদের হত্যা করা হয়। যুবকদের বন্দি করা হয়।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৫)

বিজয়ের পর হযরত খালেদ (রা.) আকরা বিন হাবিসকে আম্বার ফিরে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন এবং নিজে দুমাতুলজান্দালে অবস্থান করেন।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ২৯৩)

দুমাতুল জান্দাল বিজয়ের ফলে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান মুসলমানদের হস্তগত হয়। কেননা দুমাতুল জান্দাল এমন একটি রাস্তায় অবস্থিত যেখান থেকে তিন দিকেই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বের হয়েছে।

দক্ষিণে আরব উপদ্বীপ, উত্তর পূর্ব দিকে ইরাক এবং উত্তর পশ্চিম দিকে সিরিয়া অবস্থিত। স্বাভাবিকভাবেই এই শহরটি হযরত আবু বকর (রা.) এবং তাঁর সৈন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও মনোযোগের দাবিদার ছিল, যারা ইরাকে যুদ্ধে লিপ্ত এবং সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থান করছিল। এ কারণেই হযরত আইয়্যায দুমাতুল জান্দাল হতে নড়েননি, বরং সেখানে দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করেন এবং হযরত খালেদ (রা.)-এর সেখানে পৌঁছার অপেক্ষায় থাকেন। দুমাতুল জান্দাল মুসলমানদের দখলে না এলে ইরাকে মুসলমানরা সৈন্যরা বিপদের সম্মুখীন হত।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়্যত অউর কারনামে, ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ৪১৯-৪২০)

এরপর রয়েছে হুসায়েদ এবং খানাফেস যুদ্ধের বিবরণ। হুসায়েদ হলো কুফা এবং সিরিয়ার মাঝে ছোট একটি উপত্যকা। খানাফেস ইরাকের দিকে আম্বারের নিকটবর্তী একটি স্থান। লিখা আছে, হযরত খালেদ দুমাতুল জান্দাল-এ অবস্থান করছিলেন এবং অনারবরা রীতিমত তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। অর্থাৎ হযরত খালেদ ও মু সলমানদের বিরোধিতায়। আক্কাহ্ র প্রতিশোধের নেশায় মত্ত উপদ্বীপের আরবরা অনারবদের সাথে মিলে চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। সুতরাং বাগদাদ হতে যার মেহের এবং তার সাথে ইউযবা আম্বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তারা দুজনেই হুসায়েদ ও খানাফেসে এসে মিলিত হওয়ার অঙ্গীকার করে। হীরায় অবস্থানরত হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর নায়েব হযরত কা'কা বিন আমর এ সংবাদ শোনার পর আবেদ বিন ফাদাকীকে তিনি হুসায়েদে পৌঁছানোর আদেশ দেন এবং উরওয়া বিন জাতকে খানাফেসের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। হযরত খালেদ ওয়ালিদ (রা.) দুমা থেকে হীরা ফিরে আসেন। তখন তিনিও এবিষয়ে অবগত হন। হযরত খালেদ (রা.) -এর মিদিয়ানে আক্রমণের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এখানে এসে এসব ঘটনা জানার পর তিনি হযরত কা'কা বিন আমর এবং আবু লায়লা (রা.)-কে রূযবা এবং যার মেহেরের মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর নিকট ইমরাউল কায়েস কালবীর চিঠি আসে। মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে তিনি কুযা এবং কালব গোত্রের শাসক ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে তিনি ইসলামে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তার চিঠিতে লিখেন, হুযেয়ল বিন ইমরান মুসাইয়াখ অঞ্চলে এবং রাবিয়া বিন বুযায়ের সিনা ও বিশর অঞ্চলে সেনা সমাবেশ ঘটায়। তারা আক্কা হ্ র প্রতিশোধের নেশায় মত্ত হয়ে রূযবা এবং যার মেহেরের নিকট যাচ্ছে। এটি জানার

যুগ খলীফার বাণী

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, Murshidabad.

পরই হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) হীরায় হযরত আইয়্যায বিন গানাম (রা.)-কে তার নায়েব নিযুক্ত করে নিজেই সেখান থেকে যাত্রা করেন। তিনি খানাফেস যাওয়ার জন্য সেই রাস্তাই অবলম্বন করেন যে পথ ধরে কাকা ও আবু লায়লা গিয়েছিলেন। তিনি আইনুত্ তামার গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হন। এখানে এসে তিনি হযরত কা'কা-কে সেনাধ্যক্ষ বানিয়ে উসায়েদ অভিমুখে এবং আবু লায়লাকে খানাফেস অভিমুখে প্রেরণ করেন। তিনি তাদের উভয়কে নির্দেশ দেন, 'শত্রুদল ও তাদের উস্কানিদাতাদের ঘিরে একস্থানে জড়ো করবে, আর যদি তারা জড়ো না হয় তবে ঐ অবস্থাতেই তাদের ওপর আক্রমণ করবে।' হযরত কা'কা যখন দেখেন যে, যার মেহের ও রূযবা কোনরূপ নড়চড়া করছে না, তখন তিনি হুসায়েদ অভিমুখে অগ্রসর হন। সেখানকার আরব ও অনারব সেনাদলসমূহের নেতা ছিল রূযবা। সে যখন দেখল যে, কা'কা তার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, তখন সে যার মেহেরের কাছে সাহায্য চায়। যার মেহের নিজ বাহিনীর জন্য তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে স্বয়ং রূযবার সাহায্যার্থে চলে আসে। হুসায়েদে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়; সেখানে খুব তীব্র লড়াই হয়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বিপুল সংখ্যক অনারব যুদ্ধে নিহত হয়। কা'কা যার মেহেরকে হত্যা করেন এবং রূযবাও নিহত হয়। এই যুদ্ধে ব্যাপক পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়। হুসায়েদ থেকে পালিয়ে বাঁচা সৈন্যরা খানাফেস গিয়ে জড়ো হয়। খানাফেসের যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু লায়লা নিজ বাহিনী এবং তার কাছে আগত সাহায্যকারী বাহিনীর সবাইকে নিয়ে খানাফেস অভিমুখে যাত্রা করেন। হুসায়েদের পরাজিত সেনারা যার মেহেরের স্থলাভিষিক্ত সেনাপতির কাছে উপস্থিত হয়। সে যখন মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পায় তখন খানাফেস ছেড়ে সবাইকে সাথে নিয়ে মুসাইয়াখ পালিয়ে যায়; সেখানকার কর্মকর্তা ছিল হুযায়েল। খানাফেস জয় করতে আবু লায়লাকে কোন বেগ পেতে হয়নি। এই সকল বিজয়ের সংবাদ হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ সমীপে প্রেরণ করা হয়।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৫-৩২৬) (মুজামুল বুলদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০৭,৪৪৬)

'মুসাইয়াখ'-এর যুদ্ধ; হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ যখন হুসায়েদবাসী ও খানাফেসবাসীর পালিয়ে যাবার খবর জানতে পারেন, তখন তিনি হযরত কা'কা, আবু লায়লা, আ'ওয়াদ ও উরওয়ার প্রতি একটি পত্র প্রেরণ করেন, যাতে তিনি একটি নির্ধারিত রাতের নির্দিষ্ট সময়ে মুসাইয়াখে তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হবার প্রতিশ্রুতি দেন। মুসাইয়াখ, খোরান ও কালদ্ এর মাঝামাঝি অবস্থিত একটি স্থান। খোরান-ও দামেস্কের নিকটবতী একটি বিস্তৃত অঞ্চল যেখানে অসংখ্য জনপদ ও ক্ষেত-খামার ছিল। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ আইনুত্ তামার থেকে মুসাইয়াখ অভিমুখে যাত্রা করেন; আর নির্ধারিত রাতের নির্দিষ্ট সময়ে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ এবং তার সেনাধ্যক্ষরা মুসাইয়াখের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করেন আর হুযায়েল, তার সৈন্যবাহিনী ও সকল শরনাথীর ওপর তিনদিক থেকে আক্রমণ রচনা করেন। হুযায়েল কিছু লোকজনসহ প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যায়।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৬) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ১০৯)

এই যুদ্ধে এমন দু জন মুসলমান ইসলামী সেনাদলের হাতে নিহত হয় যারা মুসাইয়াখের বসবাসরত ছিল এবং যাদের কাছে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) প্রদত্ত নিরাপত্তাপত্রও ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক যখন তাদের নিহত হবার সংবাদ পান তখন তিনি তাদের রক্তপণ প্রদান করেন। হযরত উমর জোর দিচ্ছিলেন যে, এই কাজের জন্য হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদের শাস্তি হওয়া উচিত। হযরত উমর খুবই উত্তেজিত ছিলেন যে, কেন মুসলমানদের হত্যা করা হলো; কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, যেসব মুসলমান শত্রুদেশে শত্রুদের সাথে মিলেমিশে বসবাসরত থাকে, তাদের সাথে এমন ঘটনা ঘটে যাওয়া তেমন গুরুতর কোন বিষয় নয়, এমনটি ঘটতেই পারে। তথাপি হযরত আবু বকর (রা.) তাদের সন্তানদের লালন-পালন ও দেখাশোনা করার বিষয়ে ওসীয়্যতও করেন।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৩১১) (তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৭)

সান্নী ও যুমায়েল-এর ঘটনা; যুমায়েল একটি স্থানের নাম, এর নাম বিশর বলেও বর্ণিত হয়েছে এবং এটি সান্নী নামক স্থানের লাগোয়া। আইনুত্ তামার-এর যুদ্ধে আক্কাহ্ নামক যে ব্যক্তি নিহত হয়েছিল, তার প্রতিশোধ নেয়ার জিঘাংসায় রবীআ বিন বুজায়ের নিজের বাহিনী নিয়ে সান্নী ও বিশর আসে। হযরত খালেদ মুসাইয়াখের যুদ্ধে জ য়লাভের পর কা'কা ও আবু লায়লাকে সম্মুখে প্রেরণ করেন এবং একটি রাত নির্দিষ্ট করে সিদ্ধান্ত দেন যে, মুসাইয়াখের মতো এখানেও আমরা একসাথে তিনদিক থেকে শত্রুর ওপর আক্রমণ করব। এরপর হযরত খালেদ মুসাইয়াখ থেকে যাত্রা করে বিভিন্ন স্থান হয়ে যুমায়েল আসেন। হযরত খালেদ সান্নী থেকে লড়াই আরম্ভ করেন, তার দুই সহযোগীও এখানে এসে তার সাথে যুক্ত হন। তারা তিনজনই রাতের বেলা তিনদিক থেকে রবীআর বাহিনী এবং যারা খুব গর্বের সাথে লড়াই করতে এখানে একত্রিত হয়েছিল - তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করেন এবং তরবারি টেনে তাদেরকে এমনভাবে কচুকাটা করেন যে, কেউ পালিয়ে কোথাও সংবাদ দেয়ারও সুযোগ পায়নি। তাদের নারীদের গ্রেফতার করা হয়, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের 'খুমুস' (অর্থাৎ এক পঞ্চমাংশ) হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অবশিষ্ট যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমান সেনাবাহিনীতে বণ্টন করে দেওয়া হয়। হুযায়েল, যে মুসাইয়াখের যুদ্ধেও পরাজিত হয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল; সে অঙ্গীকার অনুসারে রবীআ বিন বু যায়েরের সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। এখন পুনরায় সে পালিয়ে যুমায়েল বিন আত্তাবের কাছে আশ্রয় নেয়। আত্তাব বিরাট সেনাবাহিনীর সাথে বিশর নামক স্থানে অবস্থান করছিল। রবীআর পরাজিত হওয়ার সংবাদ তার কাছে পৌঁছানোর পূর্বেই হযরত খালেদ (রা.) তার ওপরও তিনদিক থেকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধেও বিপুল সংখ্যক মানুষ নিহত হয় এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমাদের হস্তগত হয়। হযরত খালেদ (রা.) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দেন এবং 'খুমুস' (অর্থাৎ এক পঞ্চমাংশ) হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে পাঠিয়ে দেন। হযরত খালেদ (রা.) বিশরের নিকটবর্তী একটি স্থান রূযাবের দিকে যান। সেখানকার কর্মকর্তা ছিল হেলাল বিন আক্কাহ্ । তার সেনাবাহিনী হযরত খালেদের (রা.) আগমনের সংবাদ পেয়ে তার থেকে পৃথক হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে হেলাল সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং মুসলমানরা বিনা বাধায় রূযাবকে নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৭-৩২৮) (মুজামুল বুলদান, ৩য় খণ্ড ,পৃ: ১৭০)

এরপর 'ফিরাজ'-এর যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, ফিরাজ বসরা ও ইয়ামামার মধ্যবতী একটি স্থানের নাম। এখানে সিরিয়া, ইরাক ও জাযিরার পথ এসে মিলিত হয়। এই যুদ্ধ মুসলমান ও রোমানদের মাঝে দ্বাদশ হিজরী সনের জিলক্বদ মাসে ফিরাজ নামক স্থানে সংঘটিত হয়। এ কারণেই এই যুদ্ধ ফিরাজের যুদ্ধ হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) রূযাব দখলের পর ফিরাজ পৌঁছেন। এই সফরে হযরত খালেদকে অনেক যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়। এখানে হযরত খালেদ (রা.) রমজানের রোযাও রাখতে পারেননি। হযরত খালেদের (রা.) এসব অতর্কিত আক্রমণ এবং বিভিন্ন গোত্রের তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হওয়ার সংবাদ সমগ্র ইরাকে ছড়িয়ে পড়ে আর এতে মরুভূমিতে বসবাসকারী সমস্ত গোত্র ত্রস্ত ছিল। তারা মুসলমানদের সামনে অস্ত্র সমর্পণ এবং তাদের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়াকেই নিজেদের জন্য ভাল হবে বলে মনে করে। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ(রা.) নিজ সেনাবাহিনীর সাথে ফুরাত নদীর তীর ঘেঁষে উত্তরাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি যেখানেই পৌঁছতেন সেখানকার অধিবাসীরা তার সাথে সন্ধি করে নিতো এবং তার আনুগত্য করার অঙ্গীকার করত। পরিশেষে তিনি ফিরাজ পৌঁছেন যেখানে সিরিয়া, ইরাক এবং আল জাযিরার সীমান্ত মিলিত হয়। ফিরাজ সিরিয়া ও ইরাকের সর্ব উত্তরে অবস্থিত। যদি আইয়্যায বিন গানামের ভাগ্য সহায় হতো আর তিনি সূচনাতেই দুমাতুল জ ন্দাল বিজয় করে নিতেন, তাহলে সম্ভবত হযরত খালেদ (রা.) এখান পর্যন্ত পৌঁছতেন না, কেননা হযরত আবু বকরের (রা.) ইচ্ছা সমগ্র ইরাক ও সিরিয়া জয় করার ছিল না। তিনি শুধু এটি চাচ্ছিলেন যেন এই দুই দেশের সীমান্ত, যা আরবের সাথে যুক্ত, সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় আর এই দিকগুলো থেকে ইরানী ও রোমানরা যেন আরবের ওপর আক্রমণ করতে না পারে। কিন্তু এই দুই দেশ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের করায়ত্ত হবে কিন্তু আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত এটিই ছিল। এজন্য তিনি এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন যে, হযরত খালেদ (রা.) ইরাকের গোত্রগুলোকে অনুগত করার উদ্দেশ্যে উত্তরের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যান। আর এভাবে মুসলমানদের জন্য উপরের অর্থাৎ উত্তর দিক থেকে সিরিয়াতে আক্রমণ করার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

ইরানী সীমান্ত হতে রোমানদের ওপর আক্রমণ করার পথ খুলে যাওয়া এমন এক নিদর্শন ছিল যার ধারণা হযরত আবু বকর (রা.)-ও করতে পারেন নি। আর এই কৃতিত্ব এমন এক ব্যক্তির হাতে সাধিত হয় যার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে আরব ও অনারব নারীরা সত্যিই অপারগ ছিল! যেমনটি হযরত আবু বকর (রা.) বলেছিলেন। ফিরাজে হযরত খালেদকে (রা.) পুরো

একমাস অবস্থান করতে হয়। এখানেও তিনি এমন বীরত্ব, দৃঢ়তা ও অবিচলতার পরিচয় দেন যার দৃষ্টান্ত নেই। তিনি চতুর্দিক থেকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। পূর্বদিকে ছিল ইরানীরা, যারা তার রক্তের পিপাসু ছিল। পশ্চিম দিকে ছিল রোমানরা, যাদের ধারণা ছিল যদি এই সময়ে খালেদের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন না করা হয় তাহলে এই বন্যা ঠেকানো যাবে না। রোমান ও মুসলমানদের মাঝে কেবল ফুরাত নদীই প্রতিবন্ধক ছিল। এছাড়াও চারদিকে বেদুঈন গোত্রসমূহের বসবাস ছিল যাদের বড় বড় নেতাদের হত্যা করে হযরত খালেদ তাদের হৃদয়ে প্রতিশোধের এমন আগুন প্রজ্জলিত করেছিলেন যা কখনো নেভার মতো নয়। এই স্পর্শকাতর পরিস্থিতি সম্পর্কে হযরত খালেদ অনবহিত ছিলেন না। তিনি যদি চাইতেন তাহলে হীরা ফিরে এসে নিজের শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি করে পুনরায় রোমানদের মোকাবিলা করার জন্য যাত্রা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এমনটি করেননি, কেননা শত্রুদের নিজের সম্মুখে দেখে হযরত খালেদ (রা.)-এর জন্য ধৈর্য ধারণ করা অসম্ভব ছিল এবং অসম্ভব হয়ে যেত। তার প্রকৃতিই এমন ছিল। তার দৃষ্টিতে ইরানী আর মরুবাসী, সবাই জয় করা সম্ভব। তাদের বিশাল সেনাবাহিনীকে না পূর্বে তিনি কখনো সমীহ করেছেন আর না ভবিষ্যতে সমীহ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাই তিনি একান্ত প্রশান্ত চিত্তে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকেন। অপরদিকে রোমানরাও পূর্বে কখনো হযরত খালেদের মুখোমুখি হয়নি আর তারা তার আক্রমণের ক্ষীপ্রতা সম্পর্কে অনবহিত ছিল। ইসলামী সৈন্যবাহিনী যখন ফিরাজে একত্রিত হয় আর লাগাতার একমাস ধরে তাদের সামনে ঘাঁটি গেড়ে অবস্থান করে তখন তাদের মাঝে অনেক উত্তেজনা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। তারা তখন নিজেদের নিকটবর্তী ইরানী সেনাঘাঁটিসমূহ থেকে সাহায্যের আবেদন জানায়।

ইরানীরা অতি আনন্দের সাথে রোমানদের সাহায্য করে, কেননা মুসলমানরা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করেছিল এবং তাদের শৌর্যবীর্যকে ভূলুণ্ঠিত করে তাদের অহংকার ও দাম্ভিকতাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। ইরানীরা ছাড়া তাগ্‌লেব, ইয়াদ এবং নামের-এর আরব বংশোদ্ভূত গোত্রসমূহও রোমানদের পূর্ণ সাহায্য করেছে, কেননা তারা তাদের নেতা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হত্যার কথা ভুলেনি। সুতরাং রোমান, ইরানী এবং আরব বংশোদ্ভূত গোত্রসমূহের এক বিশাল সেনাবাহিনী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ফুরাত নদীর নিকটে এসে তারা মুসলমানদের কাছে সংবাদ পাঠায় যে, 'তোমরা নদী অতিক্রম করে আমাদের নিকট আসবে নাকি আমরা নদী পার হয়ে তোমাদের দিকে আসবো? হযরত খালেদ উত্তর পাঠান যে, 'তোমরাই আমাদের দিকে আস, তোমরা যেহেতু যুদ্ধ করতে এসেছ তাই তোমরাই এদিকে চলে এস'। অতএব শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনী নদী পার করে অপর পাড়ে এসে জড়ো হতে থাকে। ইতিমধ্যে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) নিজ সেনাবাহিনীকে খুব ভালোভাবে এবং রীতিমত সারিবিন্যস্ত করে শত্রুপক্ষের সাথে যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করে তোলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় হলে রোমান বাহিনীর সেনাপতি তার সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেয় যে, সকল গোত্র যেন পৃথক পৃথক হয়ে যায়, যাতে করে এটি বুঝা যায় যে, কোন্ দল অধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। সুতরাং পুরো সেনাবাহিনী তাদের স্ব স্ব দলপতির সাথে পৃথক পৃথক হয়ে যায়। যুদ্ধ শুরু হলে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ নিজ সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন তারা যেন শত্রুদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে আর তাদেরকে এক স্থানে একত্রিত করে তাদের ওপর এমনভাবে মুহুর্মুহু আক্রমণ করে যে, তারা যেন নিজেদের সামলে নেওয়ার সুযোগও না পায়। সুতরাং এমনটিই হয়। ইসলামী সৈন্যদল রোমান সেনাবাহিনীকে ঘিরে নিয়ে একস্থানে একত্রিত করে ফেলে এবং তাদের ওপর শক্তিশালী আক্রমণ শুরু করে। রোমান ও তাদের মিত্রদের এই ধারণা ছিল যে, তারা গোত্রগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করে যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করতে পারবে আর মুসলমানরা যখন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়বে তখন তাদের ওপর পূর্ণ আক্রমণ করে তাদেরকে পরাজিত করবে। কিন্তু তাদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ প্রমাণিত হয় আর তাদের পরিকল্পনা তাদের জন্য বুমেরাং হয়েছে।

মুসলমানরা যখন তাদেরকে একস্থানে একত্রিত করে তাদের ওপর আক্রমণ আরম্ভ করে তখন তারা তা সামলে উঠতে পারেনি এবং খুব দ্রুত পরাজয় বরণ করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে থাকে। কিন্তু মুসলমানরা তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়, তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং অনেক দূর পর্যন্ত তাদেরকে হত্যা করতে থাকে। সকল ঐতিহাসিক এই বিষয়ে একমত যে, এই যুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র ও যুদ্ধ পরবর্তী পশ্চাদ্ধাবনের সময় শত্রুপক্ষের প্রায় এক লক্ষ সৈন্য নিহত হয়েছিল। বিজয় অর্জনের পর হযরত খালেদ ফিরাজে দশ দিন অবস্থান করেন এবং ১২ হিজরী সনের জিলক্বদ মাসের ২৫ তা রখে তিনি তার সেনাবাহিনীকে হীরার দিকে ফিরতি যাত্রা করার নির্দেশ দেন।

(হযরত সৈয়্যদনা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৩১২-৩১৫) (তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৮) (মুজামুল বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৭৬)

একজন লেখক এই যুদ্ধের ওপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেনহযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে প্রথমবার মুসলমানরা পারস্য ও রোম উভয় পরাশক্তি এবং তাদের সমমনা বিভিন্ন আরব বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছে। এসত্ত্বেও মুসলমানরা মহা বিজয় লাভ করেছে। আর নিঃসন্দেহে এসব যুদ্ধ ঐতিহাসিক এবং চূড়ান্ত যুদ্ধ ছিল। যদিও এসব যুদ্ধ অন্যান্য বড় বড় যুদ্ধের ন্যায় পরিচিতি পায় নি কিন্তু আর যাহোক এসব যুদ্ধের মাধ্যমে কাফেরদের অভ্যন্তরীণ শক্তি ধ্বংস হয়ে যায়, তা পারস্য, রোম, আরব বা ইরাক যারই হোক না কেন। ইরাকে খালেদ সাইফুল্লাহ্ যে যুদ্ধ সম্পাদন করেছে তা ছিল এসবের শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পর পারসিকদের মর্যাদা ও অহংকার ধুলোয় মিশে যায়। এরপর তারা আর এমন সামরিক শক্তি অর্জন করতে পারেনি যা দেখে মুসলমানরা ভীত হতে পারে।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়্যত অউর কারনামে, প্রণেতা- সালাবী, পৃ: ৪২৩)

একজন ঐতিহাসিক ফিরাজের যুদ্ধের গুরুত্ব এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, উলায়েসে মুসলমানদের বিজয় লাভের পর পারসিকদের কোমর ভেঙেযায়। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখেন এবং যথাক্রমে আমগেশিয়া, হীরা, আম্বার, আইনুত্ তামার এবং দুমাতুল জান্দাল জয় করে নেয় আর এরপর তারা ফিরাজে এসে উপস্থিত হয়।ফিরাজ ফুরাত নদীর অববাহিকায় অবস্থিত একটি শহর। আর এটি রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তের অতি নিকটে অবস্থিত ছিল। এখানে রোমান, পারসিক এবং খ্রিষ্টান গোত্রগুলোর সম্মিলিত সেনাবাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ এই বিশাল সেনাবাহিনীকেও পরাজিত করেন। আরব বিজেতা সৈয়্যদনা খালেদ বিন ওয়ালিদ এক বছর দুই মাসে ইরাক জয় করে ফেলেন। তার সাথে মোট দশ হাজার সৈনিক ছিল আর প্রায় সমপরিমাণ সৈন্য অন্যান্য ইসলামী সেনাপতিদের সাথে ছিল। এত স্বল্পসংখ্যক সেনাবাহিনী এই সময়ে যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে তা ইতিহাসে অতুলনীয়। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন কোনো ক্ষেত্রেই তাকে পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়নি। মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে তিনি 'সাইফুল্লাহ' তথা 'আল্লাহ্ র তরবারি' খেতাব লাভ করেছিলেন। আর তিনি এই খেতাবের যথাযথ অধিকার আদায় করেছেন। এরপর তিনি যেসব অঞ্চল জয় করেছেন সেখানে এত চমৎকার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, জনমানুষ ইরানী শাসনের বিপরীতে আরবের শাসন ব্যবস্থাকে পছন্দ করা আরম্ভ করে। যাহোক আরবের শেষ বিজয় ছিল ফিরাজের বিজয়। হযরত খালেদ দশ দিন পর্যন্ত ফিরাজে অবস্থান করে এরপর অর্ধেক সৈন্য নিয়ে সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করেন।

ইরাক বিজয়ের দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক। এ সম্পর্কে লেখা আছে যে, ইরাক বিজয় একটি মহা সফলতার নিদর্শন ছিল। মুসলমানরা পারসিক বাহিনীকে যারা মুসলমানদের তুলনায় সংখ্যায় ও সামরিক সাজসরঞ্জামে অনেকগুণ বেশি শক্তিশালী ছিল পর্যায়ক্রমে ধ্বংসাত্মকভাবে পরাজিত করে। স্মরণ রাখতে হবে, ইরানী সেনাবাহিনী সেযুগে সবচেয়ে মারাত্মক সামরিক বাহিনী ছিল। হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালের এটি এমন এক মহান কৃতিত্ব যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া ভার। এতে কোন সন্দেহ নেই, সামরিক ক্ষেত্রে সকল সফলতা হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ এবং তার সঙ্গি সেনাপতিদের কৃতিত্বে অর্জিত হয়েছে কিন্তু এই বাস্তবতাকেও অস্বীকার করা যায় না যে, এসব বিজয় ও সফলতা হযরত আবু বকর (রা.) -এর মত মহান ব্যক্তিত্বের তত্ত্বাবধানে অর্জিত হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, কোনো সেনাবাহিনীর বড় বড় যোগ্য সেনাপতি এমন দৃঢ়তা ও অবিচলতা, একতা এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করতে পারে না যতক্ষণ তার তত্ত্ব াবধায়কের ব্যক্তিগত গুণাবলী ও উন্নত ভূমিকা তাদের প্রভাবিত না করে।

অস্বীকারকারী মুরতাদ ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে শুরু করে ইরাক বিজয়ের সকল পর্যায়ে হযরত আবু বকর (রা.) যে ব্যক্তিগত আদর্শ ও উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং অবিচলতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন তা উম্মতে মুসলেমার হৃদয়কে বড় বড় কুরবানী করার জন্য উদ্দীপ্ত করে রেখেছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাত

২৮ শে আগস্ট, ২০২১ তারিখে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া জার্মানীর সদস্যবৃন্দদ প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর সঙ্গে অন-লাইন সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করে। হুযুর আনোয়ার ইসলামাবাদ (টিলফোর্ড) স্থিত নিজ অফিস থেকে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। অপরদিকে ১০০০ এর বেশি আতফাল অনলাইনে ম্যানহেইম শহর থেকে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। অতঃপর আতফালসদস্যবৃন্দ হুযুর আনোয়ারকে সরাসরি কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ পায়। খুদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানীর বিগত অনলাইন সাক্ষাতের সময় বৃষ্টি হচ্ছিল, যে সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার বলেন, আতফালদের হলঘরে বসানো হয়েছে, খুদ্দামদের অনুষ্ঠানের বৃষ্টি থেকে আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। এমনিতেও এরা, মাশাআল্লাহ্ মুজাহিদ (যোদ্ধা)। বর্তমানে (জুমআর খুতবায়) বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ হচ্ছে। সেখানেও ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সেই তেরো-চৌদ্দ বছরের শিশুরাই তো ছিল যারা সেখানে অবিচল ছিল। তাই উদ্বিগ্ন হয়ো না, আমাদের এই আতফালরাও মাশাআল্লাহ্ মুজাহিদ। কিন্তু এদেরকে ভিতরে বসিয়ে ভালই করেছেন। শুধু শুধু বসে বসে বৃষ্টিতে ভেজা কোনও মানে হয় না।

* একজন তিফল প্রশ্ন করে যে, জার্মানীতে ১২ বছরের উর্ধ্বের শিশুদের কোরোনা ভ্যাকসিন দেওয়ার অনুমতি আছে। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের মতে এই টিকা নেওয়া উচিত আবার কারো কারো মতে এর কোনও প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে হুযুর আনোয়ারের দিক-নির্দেশনা কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, ভাল কথা। সরকার টিকা দিলে নেওয়া উচিত, কোনও অসুবিধে নেই তাতে। অসুবিধে কিসের, এটা তো প্রতিকার। এ যাবৎ আমি নিজে যতটুকু এ নিয়ে গবেষণা করেছি বা করার নির্দেশ দিয়েছি, আমাদের অনেক আহমদী এর বিশেষজ্ঞ, শিক্ষিত শ্রেণী, চিকিৎসক মহল, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ব্রিটেন- সকলের মতে টিকা গ্রহণ করতে কোনও অসুবিধে নেই। আর যারা বলে এর অমুক অমুক ক্ষতিকারক প্রভাব রয়েছে, তাদের সংখ্যা অতিনগণ্য। প্রতিটি সাধারণ ব্যক্তির সঙ্গে এমনটি হবে না,ঝুঁকি সর্বত্রই থাকে। তাই আমার মতে টিকা লাগালে অসুবিধের কিছু নেই।

*এরপর একজন তিফল প্রশ্ন করে যে, প্রিয় হুযুর! আপনি নবজাতকদের নাম কিভাবে নির্বাচন করেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই পদে সমাসীন করার পর আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবের তৈরী করার একটি ফাইল দেখতে পাই যাতে শিশুদের জন্য নাম লেখা ছিল আর তা থেকেই তিনি নাম নির্বাচন করতেন। শিশুর নামের জন্য আবেদন এলে তা থেকে কোনও একটি নাম নির্বাচন করা হত। এরপর আমিও সেই কাজটি অব্যাহত রেখেছি এবং তাতে আরও অনেক নাম সংযোজন করেছি, এবং আপডেট করেছি। মাঝে কিছু নতুন নাম মাথায় এসেছে যেগুলি রেখেছিলাম, সেই নামগুলি এই ফাইলে যুক্ত হয়েছে। নিজে করলে আমি সেই ফাইলটি দেখে নাম রাখি। চেষ্টা থাকে যেন মা-বাবার মায়ের সঙ্গে মেল করে নাম রাখা যায়। কিন্তু অনেক সময় অন্যান্য নামও রাখা হয়।

এরপর হুযুর আনোয়ার সেই তিফলকে জিজ্ঞাসা করেন যে তার নাম কে রেখেছে? ছেলেটি উত্তর দেয় যে, হুযুর রেখেছেন। হুযুর তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে 'জাযিব'-এর অর্থ কি? তিফল উত্তর দেয়, 'আকর্ষণকারী'। হুযুর বলেন, এমন ব্যক্তি যে নিজের মাঝে আত্মভূত করে নেয়। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা নিজের মাঝে আত্মভূত করে নাও, আল্লাহ্‌র রসুলের ভালবাসা আত্মভূত কর আর পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর, তবেই তোমার নাম স্বার্থক হবে।

এক তিফল প্রশ্ন করে যে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের উদ্দেশ্য কি? হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন আর সেই সঙ্গে তিনি মানুষকে ইবাদতের পদ্ধতি শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে মানুষকে তিনি বহু গুণাবলী সহকারে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হল মানুষ। এছাড়া তিনি মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি এবং চিন্তাশক্তি দান করেছেন যার দ্বারা সে নিত্যনতুন আবিষ্কার করতে পারে। তাই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যেহেতু যেহেতু আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠতম জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছি, তাই তোমরা আমার কৃতজ্ঞতাও স্বীকার কর আর এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পন্থা হিসেবে আল্লাহ্ তা যা শিখিয়েছেন তা হল তাঁর ইবাদত করা আর এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিভিন্ন নবীদের মাধ্যমে প্রতি যুগে ইবাদতের বিভিন্ন পদ্ধতি শিখিয়েছেন। আঁ হযরত (সা.) কে তিনি প্রেরণ করে তার মাধ্যমে আমাদেরকে নামাযের আদেশ দিলেন। আর পাঁচটি নামায বিধিবদ্ধ করলেন যাতে আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারি। আর আমরা যখন আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হই, তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন তোমাদেরকে আমি যে যে বুদ্ধি ও বোধশক্তি দান করেছি এবং সুন্দর করে গড়ে তুলেছি এবং শ্রেষ্ঠতম জীব বানিয়েছি তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তোমরা যখন আমার ইবাদত কর, আমার আদেশাবলী পালন কর, তখন আমি তোমাদেরকে আরও বেশি কৃপারাজিতে ধন্য করব আরও বর্ধিত করব। আল্লাহ্ তা'লা অপরকেও দান করেন আর অন্যেরা যখন পরিশ্রম করে, তারা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত না করলেও তিনি তাদেরকে দান করেন। কিন্তু একজন আহমদী মুসলমান তথা প্রকৃত মুসলমান যখন খোদা তা'লার আদেশাবলী যথাযথভাবে পালন করে, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে পুরস্কার হিসেবে জাগতিক বিষয়াদিতেও উন্নতি দান করেন এবং তার ধর্ম তথা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও উন্নতি দান করেন।আর ইবাদতের কারণে আললাহ্ তা'লার সঙ্গে তার সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক ও অনুরাগ তৈরী হয়। তখন সে প্রতিটি কাজ আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মেনে করে। সর্বোপরি আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই জাগতিক জীবন ক্ষণিকের। খুব বেশি হলে তোমরা সত্তর বা আশি বছর জীবিত থাকবে। এর পর অনন্ত জীবন রয়েছে, সেখানে আমি তোমাদেরকে সেই ইবাদতের পুরস্কার দান করব। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা একজন পুণ্যবান তথা ইবাদতকারীকে ইহজগতেও কল্যাণমণ্ডিত করেন, সব কিছু দান করেন আর কৃতজ্ঞতা করার প্রতিদান হিসেবে পরকালেও আশিসমণ্ডিত করেন। অথচ অন্যরা এই সব আশিস থেকে বঞ্চিত থাকে। তাই আমাদের খোদা তা'লার ইবাদত করা উচিত।

এক তিফল প্রশ্ন করে যে, আমরা যে সদকা দিই তার উপকার কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের কি উপকার হয়? তুমি যদি সদকা দাও তাতে অন্তত অন্যের উপকার তো অবশ্যই হয়। আমাদেরকে অপরের উপকারের বিষয়েও চিন্তা করা উচিত কি না? শুধ নিজের উপকারের কথাই দেখব না কি অন্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখব? (তিফল উত্তর দেয় যে অন্যের প্রতিও যত্নবান থাকতে হবে) একজন গরিব মানুষ বসে আছে আর তুমি পাশে বসে বার্গার, নাড্ডোস আর ফিশ এন্ড চিপস খাচ্ছ, অপরদিকে তোমার সমবয়সী পেটে খিদে নিয়ে বসে আছে, সকালে প্রাতঃরাশও জোটেনি আর এখন খাওয়ার জন্য কিছু নেই, তার পরনের তেমন কাপড় নেই- এমন কাউকে যদি তুমি অর্থ সাহায্য কর যাতে সে ভাল পরতে পারে ও খেতে পারে, তাতে তার উপকারই তো হবে। সে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে আর সে কৃতজ্ঞতা জানালে তুমি খুশি হবে তাই তো? (তিফল উত্তর দেয় যে সে আনন্দিত হবে।) অতএব, সদকা দানের প্রথম উপকার হল আনন্দ প্রাপ্তি। দ্বিতীয় সব থেকে বড় উপকার হল তোমরা গরিবদের সাহায্য করলে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তোমাদেরকে প্রতিদান দিব। এই কাজের কারণের আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন, তোমরা পুণ্যকর্ম করলে আমি তোমাদের পুণ্যের দশগুণ প্রতিদান দিব। এমনকি সাতশগুণ পর্যন্ত বা তার চেয়েও বেশি বর্ধিত আকারে দান করব। হয়তো তুমি কাউকে পাঁচ ইউরো দান করলে, হতে পারে আল্লাহ্ তা'লা এর প্রতিদান স্বরূপ তোমাকে পাঁচশো ইউরো বা তোমার অন্য কোনও আকাঙ্খা পূর্ণ করলেন, বা আল্লাহ্ তা'লা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন আর তোমাকে আরও বেশি পুণ্যকর্ম করার তৌফিক দিলেন। তাছাড়া একটি পুণ্যকর্ম থেকে অপর একটি পুণ্যকর্মের উৎপত্তি হয় এবং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই এটাও একটা উপকার। প্রথমত তুমি একজন মানুষকে আনন্দ দিলে,তার দোয়ার ভাগীদার হলে আর তার দোয়া তোমার উপকার করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা প্রীত হলেন। তিনি নিজেও তোমাদেরকে প্রতিদান দিবেন আর তোমাদের অন্তরেও প্রশান্তি লাভ হবে, একথা ভেবে যে তুমি একজন দরিদ্রকে সাহায্য করেছ। তাই সদকা দান করা উপকারেই তো আসে তো? (তিফল উত্তর দেয় , হ্যাঁ উপকারে

আমের সফীর:আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কোভিড-এর কারণে কিছু মানুষ তাদের জীবন ধারায় পরিবর্তন এনেছেন এবং তারা হয় খোদা তা'লার আরও নিকটবর্তী হয়েছেন, অথবা অন্তত তাদের পরিবার এবং জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেগুলোকে তারা পূর্বে উপেক্ষা করছিলেন, সেগুলোকে পূর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। একটি বৈশ্বিক সংঘাত কি একটি সতর্কবাণী বা একটি যুগ সন্ধিক্ষণ হিসেবে সেই ধরনের ভূমিকা পালন করবে?

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.):এটি নিঃসন্দেহে একটি সতর্কবাণী। এমন পরিস্থিতিতে এমন মানুষ রয়েছেন যারা আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসেন। আর সেটাই আমি বিভিন্ন উপলক্ষে বর্ণনা করে আসছি। অর্থাৎ, মহৎ হৃদয়ের এবং আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ খোদা এবং ধর্মের দিকে ফিরে আসবেন। কিন্তু যখন তারা আসবেন, সেই সকল সত্য-সন্ধানীদেরকে পথ দেখানোর জন্য কোনো পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন। এই কারণেই এটি আবশ্যক যে, আমরা যেন পূর্ব থেকেই মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি, যেন যখন পরিস্থিতির উদয় হবে এবং মানুষ প্রশ্ন করবে 'এখন আমাদের কী করণীয়?', তখন যেন আমরা তাদেরকে খোদার দিকে পথ প্রদর্শন করতে পারি এবং তাদেরকে তাদের করণীয় সম্পর্কে অবহিত করতে পারি। পরবর্তী সেই সময়ে আমরা কেবল তখনই মানুষকে পথ দেখাতে পারবো যখন পূর্ব থেকেই তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে। যদি পূর্ব থেকেই তাদের সঙ্গে কোন উল্লেখযোগ্য আলাপ-আলোচনা না হয়ে থাকে, তাহলে এটি আরও কঠিন হয়ে পড়বে, কেননা, মানুষ এ বিষয়ে এমনকি পরিচিতই থাকবে না যে, আমরা কারা।আর তাই, অনেক বড় পরিসরে আমাদেরকে ইসলাম-আহমদীয়াতের বাণীকে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। আমাদেরকে মানুষের নিকট আমাদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা উচিত এবং মানবজাতিকে খোদা তা'লার আরও নিকটবর্তী করার আমাদের যে উদ্দেশ্য সেটা তাদের কাছে তুলে ধরা উচিত।আমের সফীর:হুযূর! এমন ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে আমাদের বাণী কার্যকরভাবে ছড়িয়ে দিতে পারবো, যখন যোগাযোগের অনেকগুলো মাধ্যমই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে?খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত

মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.):যেখানে মাটির বুকে কিছু ব্যবস্থা বিনষ্ট হতে পারে, এমনও হতে পারে যে, মহাকাশে (কৃত্রিম) উপগ্রহ রয়ে যাবে এবং স্যাটেলাইট ফোন অথবা স্বাভাবিক যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত অন্য কোনো মাধ্যমে তখনও যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হবে। যদি আফ্রিকা এবং অন্যান্য অঞ্চল ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পায়, তাহলে যারা নিরাপদ থাকবে তারা অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে কোনোভাবে যোগাযোগ করতে সক্ষম হতে পারে। এমন হতে পারে যে, কোনো কোনো এলাকায় এক প্রকারের ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হবে; কিন্তু অন্য এলাকা নিরাপদ থাকবে। কখনও কখনও কোন ক্ষুদ্রতর এলাকাকে দৃষ্টান্ত বানিয়ে আল্লাহ্ শিক্ষা দান করে থাকেন; কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেন না। কোনো নির্দিষ্ট এলাকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে আল্লাহ্ মানুষকে দেখিয়ে দিতে পারেন যে, মানবজাতি একটি সীমিত এলাকার ধ্বংসযজ্ঞ মোকাবেলায় কতটা অপারগ, যা এই বিষয়ে সতর্কবাণী হিসেবে কাজ করবে যে, 'যদি এমন ধ্বংসযজ্ঞ আরও বিস্তৃত পরিসরে সংঘটিত হয় তাহলে কেমন হবে'।

আমের সফীর:হুযূর! আপনি হিরোশিমায় গিয়েছিলেন এবং সেখানকার জাদুঘর দেখেছেন। হুযূর কি একটু বর্ণনা করবেন; এটম বোমা সম্পর্কে সেখানে কী দেখানো হয়েছে?

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.):হিরোশিমায় অনেক মডেল এবং ছবি ছিল যেগুলোতে চিত্রিত করা হয়েছে। যেমন, এক ব্যক্তি কোথাও বসে আছেন যিনি বোমার অভিঘাত এসে পৌঁছার মুহূর্তে সেই অবস্থানেই জমাট বেঁধে গেছেন। কেউ হতচকিত হয়ে সেই অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছেন, আর তাদের মাংস বিগলিত হয়ে তাদের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। কিছু ভবন যেগুলো বোমার আঘাতের পরও দণ্ডায়মান ছিল, যেমন একটির গম্বুজ এবং রডগুলো শুধু টিকে ছিল। এমন কিছু মানুষ ছিল যারা তাদের অবস্থানে জমাট বেঁধে গিয়েছিলেন কিন্তু ওই মুহূর্তেই তারা মৃত্যুবরণ করেন নি।

পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত রয়েছে যার ব্যাখ্যার সূত্রে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমন আগুন ও ধ্বংস সম্পর্কে অবহিত করেন, যা কোন ব্যক্তির শরীরে কোন প্রকার ক্ষতি করার পূর্বেই তার হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করে। এগুলো বর্ণনা করে যে, এমন দুর্ঘটনাসমূহ কোন ব্যক্তিকে আচমকা ঘিরে ফেলে।হিরোশিমা জাদুঘরের কিছু মডেল যেখানে নিউক্লিয়ার বোমা হামলার পর মুহূর্তের দৃশ্যাবলী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যারা সরাসরি আক্রান্ত হয়েছিল তাদের ত্বক তীব্র তাপ ও বিকিরণের প্রভাবে আক্ষরিক অর্থেই বিগলিত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

আমের সফীর:হুযূর! অন্যান্য সাম্প্রতিক যুদ্ধ ও সংঘাতের ক্ষেত্রে, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে সেই সমস্ত সংবাদ থেকে খানিকটা আড়ালে রাখতে সমর্থ হয়েছি। কিন্তু, বর্তমান পরিস্থিতিতে, শিশুরা এই সব সংবাদের অনেকটা মুখোমুখি। আমার ভাতিজি উল্লেখ করেছে যে, তাদের ক্লাসে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে যে, যদি যুদ্ধ হয় তাহলে কী করতে হবে এবং এখানে যুক্তরাজ্যে কী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, ভূগর্ভস্থ আশ্রয়কেন্দ্র অনুসন্ধান এবং টর্চের ন্যায় নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু হাতের কাছে প্রস্তুত রাখা। আমার মেয়ে আমাকে বলে যে, সে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত বোধ করছে, আর নিশ্চয়ই এমন আরও শিশুরা রয়েছে যাদের মনে অনুরূপ অনুভূতি বিদ্যমান। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের সেই সব শিশু যারা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত তাদেরকে আমরা কীভাবে আশ্বস্ত করতে পারি?খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.):আপনারা নিজ নিজ প্রজ্ঞা ও বোধবুদ্ধি অনুসারে শিশুদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলতে পারেন। তাদেরকে বুঝিয়ে বলুন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, যখন ন্যায় বিচারের অধিকার হরণ করা হয়, যখন আল্লাহ্‌র অধিকার উপেক্ষিত হয়, যখন বস্তুবাদিতা, লোভ এবং পার্থিবতা মানুষকে সম্পূর্ণরূপে মোহিত করে ফেলে, তখন এটাই তার পরিণাম। এই পথে চলার কারণে পৃথিবী আজ যে সংকটের কিনারায় এসে দাঁড়িয়ে আছে তা আমরা লক্ষ করতে পারি, আর এর যৌক্তিক পরিণাম হল যুদ্ধের সূচনা। বিশ্ব যদি যুদ্ধ পরিহার না করে সেক্ষেত্রে তার ফলাফল হবে ধ্বংসযজ্ঞ ও দুর্বিপাক। কিছু মানুষ বেঁচে থাকবেন, আর এমন কিছু আছেন যারা থাকবেন না।তবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং হিরোশিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসযজ্ঞের পরও, এমনকি পুরো নগরী পুনর্নির্মাণ করে পুনরায় গড়ে তোলা হয়। আমাদের এখনও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত, কেননা জীবন ও মৃত্যু কেবল আল্লাহ্‌রই হাতে। আমাদের দোয়া করা উচিত, যারা বেঁচে থাকবেন তারা যেন দীর্ঘ মেয়াদী ক্ষতি, যন্ত্রণা ও পেরেশানি থেকে রক্ষা পান। কিন্তু প্রথমে আমাদের সবার দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করেন এবং এই বিপদ টলিয়ে দেন।

শিশুদের দোয়া বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা রাখে। সুতরাং, শিশুদেরকে দোয়ায় অগ্রসর করুন, দোয়া করার বিষয়ে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করুন।

আমের সফীর:রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতে কিছু মানুষ পক্ষ অবলম্বন করছেন।

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.):যে কেউই সঠিক বা ভুল হয়ে থাকুন না কেন, প্রত্যেক পক্ষেরই একটি বক্তব্য থাকবে। কেউ শতভাগ ঠিক বা শতভাগ ভুল নয়। তথ্য এবং বাস্তবতা দেখুন তারপরে নিজের মতামত গড়ে তুলুন।

আমের সফীর:হুযূর! সবার মনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এই যে, যুদ্ধ এড়িয়ে বিশ্বকে একটি নিউক্লিয়ার যুদ্ধ বা বৈশ্বিক সংঘাত থেকে রক্ষা করার এখনও কি কোনো সুযোগ রয়েছে?

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.):এখনও সুযোগ আছে যদি আমরা আল্লাহ্‌র অধিকার এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার আদায় করি। তবে এ বিষয়টি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বুঝিয়ে বলেছেন যে, যখন মানুষ অন্যান্য মানুষের ওপর অন্যায়, নিপীড়ন ও নিষ্ঠুরতা পরিচালনা করে, তখন তারা এই পৃথিবীতেই এর শাস্তি পেয়ে থাকে। অন্যের প্রতি অন্যায়-অবিচারের জন্য আল্লাহ্‌র কোপানল ইহকালেই প্রকাশিত হয়ে থাকে। (শেষাংশ পরের সংখ্যায়)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 1 Sep, 2022 Issue No. 35

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

খুতবার শেষাংশ....

একদিকে যেখানে তার সকল আদেশ, বস্তুনিষ্ঠ নির্দেশনা এবং বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় পরিপূর্ণ ছিল সেখানে তার ব্যক্তিগত কৃতিত্ব তা থেকে অনেক বেশি উন্নত ছিল। কোনো নেতা অবিচলতা ও দৃঢ়প্রত্যয়ের এরচেয়ে বড় আর কী প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে যেমন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন কোন ক্ষেত্র পরিদৃষ্ট হয় না যেখানে তিনি কারো ব্যক্তিগত ক্ষমতা কিংবা কোন ব্যক্তির চাপে নতিস্বীকার করে নিজের প্রবর্তিত নির্দেশ এবং নিয়ম-কানুন বা শৃঙ্খলাকে পরিবর্তন করেছেন। শুধু তাই নয় বরং যোগ্যতাসম্পন্ন কার্যনির্বাহী অধীনস্থ দের উন্নত মান প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং আত্মত্যাগ ও কুরবানীর মান বৃদ্ধিকল্পে যে ধরনের সু ধারণা ও নির্ভরযোগ্যতার নমুনা হযরত আবু বকর (রা.) উপস্থাপন করেছেন এর তুলনা পাওয়া ভার। কোনো অধীনস্থ কি এমন নেতার নির্দেশ পালন করতে অপারগতা দেখাতে পারে যেখানে তিনি নিজেই আদেশ-নির্দেশ পালনে এবং মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পরম বিশ্বস্ততা ও ত্যাগের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। অর্থাৎ সিদ্দীকে আকবর স্বয়ং এমন ছিলেন। সৈয়্যদনা হযরত খালেদ (রা.)-এর সুনিপু ণ সামরিক রণকৌশল তাকে পৃথিবীর মহান সেনাপতিদের কাতারে দাঁড় করিয়েছে। সৈয়্যদনা খালেদ বিরুধ্ববাদীদের মোকাবিলায় আরব্য নীতির ক্ষেত্রে যে প্রজ্ঞা অবলম্বন করেছেন বরং এটি বলা অধিক যুক্তিযুক্ত হবে যে, সৈয়্যদনা খালেদ যে সমস্ত নীতিমালা সংযুক্ত করেছেন তা সামরিক ইতিহাসে এক উজ্জল অধ্যায় হয়ে থাকবে।

সৈয়্যদনা খালেদ (রা.) সাহসিক পরিকল্পনাগুলোকে সফলতা দানের জন্য মুসলমানদের রণকৌশল এবং তার সেনাবাহিনীর নিরবচ্ছিন্ন অগ্রযাত্রা তার সর্বোত্তম মাধ্যম ছিল। সৈয়্যদনা খালেদ এই উভয় বিষয়ে সর্বোচ্চ সহ্যক্ষমতা পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন। এটি কেবল এ কারণেই সম্ভব ছিল কেননা তিনি কখনো নিজ সৈন্যদের এমন সমস্যায় ফেলেননি যে সমস্যায় তিনি নিজে পতিত হননি। একদিকে যেমন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম খলীফার মর্যাদা অতুলনীয় তেমনি প্রখ্যাত সেনাপতিদের মাঝে সৈয়্যদনা খালেদ সর্বপ্রথম ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি আরবের বাইরের অঞ্চলগুলো জয় করেন। পৃথিবীর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মানচিত্রে নতুন আকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সরাসরি হাত ছিলেন হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ। প্রত্যেক মুসলমান হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনায় এবং সৈয়্যদনা খালেদ-এর সামরিক যোগ্যতায় ইরাকের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঝড়ো হাওয়ার মতো ছেয়ে গিয়েছিল।

(সীরাত সৈয়্যদানা সিদ্দীকে আকবর, প্রণেতা-আবুন নাসার, পৃ: ৬৭৯-৬৮১)

একইভাবে অন্যান্য সাম্রাজ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষেত্রেও মূল্যবান ভূমিকা রেখেছে।

যাই হোক, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগের ঘটনার অল্প কিছু অংশ বাকি রয়েছে। ইনশাআল্লাহ তা পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে। যেভাবে আমি বলেছিলাম কিছু বেশি সময় লাগবে। যুদ্ধের আলোচনা এখানেই শেষ হচ্ছে।

আগামী শুক্রবার ইনশাআল্লাহ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা আরম্ভ হতে যাচ্ছে। দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন সর্বক্ষেত্রে এই জলসাকে আশিসমণ্ডিত করেন। জলসায় যোগদানের জন্য যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে আগমন করেছেন তাদের সফর যেন নিরাপদ হয়। আর যারা ডিউটি প্রদান করবেন তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সঠিকভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন। কেননা দুই বছরের বিরতিতে বরং তিন বছর পর জলসা হতে যাচ্ছে। গত বছর সংক্ষিপ্ত পরিসরে জলসা হয়েছি ল। এখন পরিপূর্ণরূপে বড় জলসা হতে যাচ্ছে তাই কিছু প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি হতে পারে।

ব্যবস্থাপনাগত প্রতিবন্ধকতা হোক বা অন্য ধরনের প্রতিবন্ধকতা বা যেকোন প্রতিবন্ধকতা যা সৃষ্টি হবার আশঙ্কা রয়েছে সেগুলোকে আল্লাহ্ তা'লা দূর করে দিন। (আমীন)

****

১০ পাতার পর....

আসে)। হুযুর আনোয়ার বলেন, তবে বাড়ি গিয়ে সদকা দিও।

এক তিফল প্রশ্ন করে যে, আমরা যখন বিপদে পড়ি তখন কিভাবে বুঝব যে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শাস্তি দান করছেন না কি এটা একটা পরীক্ষা?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি বিপদে পড় আর কোনও অসৎ কর্মের দরুণ বিপদে পড় তবে স্বাভাবিকভাবেই বোঝা গেল যে শাস্তি হচ্ছে। আর যদি কোনও অসৎ কাজ না করে থাক আর এমনিতেও বিপদ এসে পড়েছে, দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তবে এর অর্থ এটা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা। নবীগণ আল্লাহ্র অনেক প্রিয়, কিন্তু তারাও বিপদে পড়েন, দুঃখ-দুর্দশা তাদের জীবনেও আসে, তারা ব্যধিগ্রস্ত হন এবং সমস্যায় নিপতিত হন। আঁ হযরত (সা.) তো আল্লাহ্ তা'লার সব থেকে বেশি প্রিয় নবী ছিলেন। তিনিও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর এমন সময় এসেছে যখন খাওয়ার জন্য কিছু থাকত না। যুদ্ধের সময় এমন দিনও গেছে যখন তিনি পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার নিকট তাঁর থেকে বেশি প্রিয় আর কে ছিলেন? তিনিও তো দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে পড়েছেন। এছাড়াও রয়েছে যুদ্ধ জনিত বিপদাবলী। দিনের পর দিন অভুক্ত থেকেছেন। হযরত আয়েশা বলেন, আমাদের বাড়িতে ক্রমাগত কয়েক দিন পর্যন্ত হাঁড়ি উনুনে চড়ত না। কখনও কখনও খাবার আসত আর তিনি (সা.) ঝোলের মধ্যে রুটি খেতেন আর বলতেন, কত উৎকৃষ্ট খাদ্য! তোমরা বাড়িতে এক বেলা খাবার না পেলে বলে বস যে বিপদে পড়েছ।এই বিপদাপদ আসে। কখনও কোনও সাহাবী যখন জানতে পারতেন যে আঁ হ যরত (সা.) অভুক্ত রয়েছেন, তখন তিনি নেমন্তন্ন করতেন, তাঁকে সঙ্গে করে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেন। মা যদি বার্গার খাওয়ার জন্য পয়সা না দেন, আব্বা পয়সা না দেন বা স্কুল যাওয়ার জন্য হত খরচ না দেন বা জ্বরে পড়ে যাও,তবে তোমরা বল যে বিপদে পড়েছ। তোমাদের জন্য এগুলিই বিপদ। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আমার যতটা প্রবল জ্বর হয় তা যদি তোমাদের হয় তবে সহ্য করতে পারবে না। তাই মানুষ যদি আল্লাহ্র কারণে দুঃখ-দুর্দশা সহন করে, পুণ্যকর্ম করে, কোনও অসৎ কাজ না করে, যদি তোমরা মনে কর যে কোনও অসৎ কাজ করো নি বরং পুণ্যের কাজ করছ, তুমি নামায পড়, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের অধিকার প্রদানকারী আর মানুষেরও অধিকার প্রদানকারী, তোমরা কারো সঙ্গে ঝগড়া কর না, কারো অধিকার আত্মসাৎ করো না, তবে পথে যা কিছু বিপদাপদ আসে, তা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে পরীক্ষা। আল্লাহ তা'লা এটাও দেখেন যে তোমার মাঝে সহনশীলতা আছে কি না। আর যখন তুমি সহ্য করেও আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর আর একথা বল যে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিতে তুমি সন্তুষ্ট,তখন আল্লাহ্ তা'লা এর পুরস্কার দেন আর এর ফলে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে। এই দুঃখ-দুর্দশার পর যখন স্বচ্ছলতা তৈরী হয় তখন বোঝা যায় যে আল্লাহ্ তা"লা আমাদের পরীক্ষ নিচ্ছিলেন। কিন্তু সেই বিপদের সময় যদি মুখ থেকে অকৃতজ্ঞতা বা অভিযোগমূলক শব্দ বের করতে শুরু কর, সেক্ষেত্রে দুঃখ-দুর্দশার কাল প্রলম্বিত হয়। আর হতে পারে অকৃতজ্ঞ হওযার কারণেণ সেই পরীক্ষা তোমার জন্য শাস্তির কারণও হয়ে দাঁড়ায়। অতএব, সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞ থাক, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত কর আর বান্দার অধিকার প্রদান কর, যার পরিণামে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। তখন মানুষ জানতে পারে যে, তার দুঃখ-দুর্দশা আসলে শাস্তি ছিল না বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা ছিল।

এক তিফল প্রশ্ন করে যে, বাল্যকালে আপনার মা বানাতেন এমন প্রিয় খাবার কোনটি ছিল?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা শৈশবে কখনও এটা খাব না সেটা খাব না করি নি। বাড়িতে যা রান্না হয়েছে তাই খেয়েছি। কখনও ডাল রান্না হলে ডাল খেয়েছি, কখনও মাংস বা মাংস আলুর রান্না হলে সেটাই খেয়েছি। উচ্ছে বা লাউ রান্না হলে সেটা খেয়েছি। আজকাল তোমরা এটা খাব না সেটা খাব না বলে জেদ করে থাক। আমাদের এমন কোনও জেদ ছিল না। মা-বাবা বলতেন খাবার রান্না হয়েছে খেয়ে নাও আর আল্লাহ্কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। খাবারের বাছ বিচার করার অভ্যাস ছাড়।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir